উপনিষদের গল্প

অরূপ

ঈষ্টার্ণ পাবলিশার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি, এ

৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

দাম পাঁচ সিকা

দাম এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মশায়কে

শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য

আমরা গল্প ভালবাসি। আমরা কেন পৃথিবীর সব দেশের লোকই গল্প ভালবাসে। হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষও গল্প ভালবাসত।

বহু হাজার বছর আগেকার দিনের মানুষরা কিভাবে গল্প তৈরী করতেন, উপনিষদের গল্প পড়লে আমরা তা জানতে পারি। উপনিষদের গল্পগুলোই পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্প। তার আগেকার তৈরী কোন গল্পই আমরা আর পাই নে। এই দিক থেকে বিচার করলে উপনিষদের গল্প আমাদের মস্ত গৌরবের ও আদরের জিনিস।

এগুলো ইতিহাস নয়। ঋষিরা এই সব গল্প বলে অত্যন্ত কঠিন জ্ঞানের কথা শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন। তাতে বিষয়টি সহজ হয়েছে, সরসও হয়েছে। ইতিহাস না হলেও এগুলোর ভেতর দিয়ে তখনকার দিনের অনেক খবরই আমরা পাই।

গল্পের ভেতর দিয়ে কোন উপদেশ শিক্ষা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি গল্পগুলোই বলবার চেষ্টা করেছি। যে কোন ধর্মমতে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী কারুর মনেই এগুলো দুঃখ দেবে না।

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৫১

অরূপ (স্বামী প্রেমঘনানন্দ)

সূচীপত্র
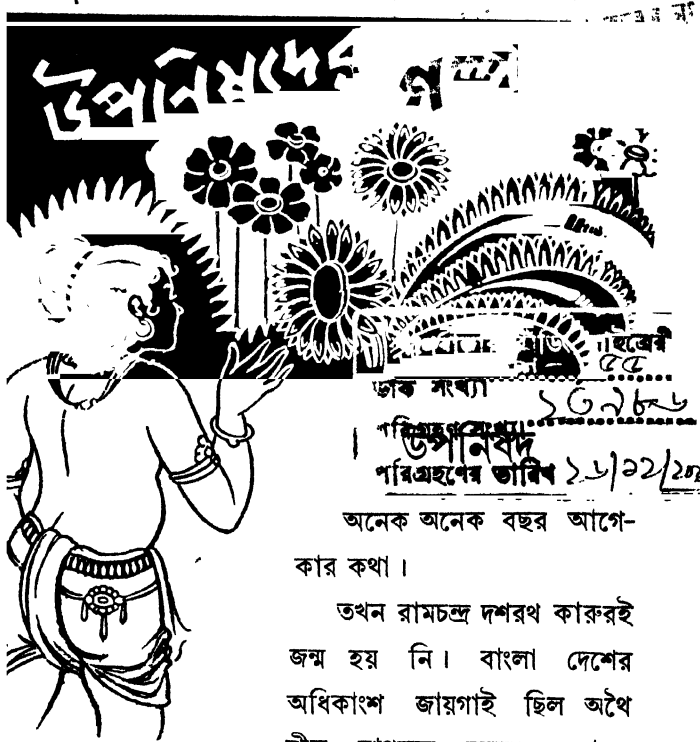
অনেক অনেক বছর আগেকার কথা।

তখন রামচন্দ্র দশরথ কারুরই জন্ম হয় নি। বাংলা দেশের অধিকাংশ জায়গাই ছিল অথৈ নীল সাগরের অতল তলায়। বাংলার উত্তর সীমায় রূপালী বরফের মুকুট মাথায় দিয়ে যে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে, সেদিনও তারা ঠিক এমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। এরা ছাড়া সেদিনের ঘটনা দেখেছে, পৃথিবীর এমন আর কেউ বেঁচে নেই।

গোটা ভারতটাই ছিল বনজংগল। আর সেই সব বনে-জংগলে ভীষণ ভীষণ জন্তু জানোয়ারের পাশে বাস করত অনেক রকম বুনো মানুষ। জন্তুদের চাইতে তারাও বড় কম ছিল না।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সিন্ধু নদের তীরে তখন একদল লোক বাস করতেন। তাঁরা বুনো ছিলেন না, ছিলেন সভ্য। আর বুনোদের চাইতে তাঁদের চেহারাও ছিল অনেক সুন্দর। নিজেদের তাঁরা বলতেন আর্য।

আর্যদের শক্তিও ছিল খুব। বুনোদের সংগে প্রায়ই তাঁদের লড়াই হত। বুনোদের এক একটা দলকে আর্যেরা এক একটা নাম দিয়েছিলেন। কাউকে তাঁরা বলতেন দৈত্য, কাউকে দানব, আবার কাউকে বলতেন রাক্ষস। এক সংগে সব জাতের বুনোকেই তাঁরা অসুর বলে ডাকতেন। অসুররা মাঝে মাঝে আর্যদের গ্রামে এসে উৎপাত করত। তখন তাঁরা লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দিতেন। আবার অনেক অসুরকেও তাঁরা শিক্ষা দিয়ে সভ্য করে নিজেদের সমাজে তুলে নিতেন।

আর্যদের একটি ছোট গ্রাম। কাছেই সিন্ধু কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার সংগে সংগেই আকাশে উঠেছে শরতের চাঁদ। কুটিরগুলোর সামনেকার খোলা জায়গায় গ্রামের ছেলেমেয়ে বুড়ো বুড়ী মেয়েপুরুষ সবাই জমা হয়েছে। চাঁদের আলোয় যেন বান ডেকেছে। ঘুমন্ত পাখিরাও মাঝে মাঝে জেগে উঠছে, আর আধ আধ স্বরে বলছে—কি সুন্দর, কি সুন্দর।

দীর্ঘকায় সুপুরুষ যুবা চেতস তার দাদুকে জিগগেস করলে, দাদু, ঐ সুন্দর চাঁদ, এই সুন্দর জোছনা কে তৈরী করেছে? এগুলো কোত্থেকে আসছে?

সকলের আনন্দ কোলাহল নিমেষেই থেমে গেল। ছোটরা বললে, হ্যাঁ, এগুলো কে করেছে, আর কোত্থেকে আসছে ?

মেয়েরা বললে, সত্যিই, এগুলো কোত্থেকে আসছে ?

এক পাশে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। বাঘ ভালুকের আর রাক্ষসের ভয় আছে, তাই যুবকরা নানা রকম অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে। সকলের মনে এক সংগে প্রশ্ন জেগে উঠল,— কে ? কে এগুলো তৈরী করেছে ?

তখনকার দিনে কোন রকম স্কুল পাঠশালা ছিল না, কোন রকম বইও ছিল না, এমন কি লেখাপড়ারও কোন পাট ছিল না। তখন লোকের মুখে মুখে অতি অল্প সময়ের মাঝেই খবর ছড়িয়ে পড়ত।

শুকনো বনের কোন একটা জায়গায় যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, সে আগুন দেখতে না দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যুবক চেতসের মনের কোণে যে জিজ্ঞাসার আগুনটি একদিন দপ করে জ্বলে উঠল, অল্প দিনের মাঝেই সমস্ত আর্য জাতির মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ল।

ভোরের বেলা পুব-আকাশ রাঙা করে সোনার থালার মত সূর্য উঠল ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে। পাখিরা ডেকে উঠল। ঘুমন্ত কুঁড়িরা ফুল হয়ে হাসতে হাসতে জেগে উঠল আর তারই সংগে জেগে উঠল আনন্দ-কলরবে আর্যদের কচি কচি শিশুগুলো।

শিশুরা জিগগেস করলে, এই সুন্দর সুন্দর ফুল আর সুন্দর সুন্দর এত সব প্রজাপতি কে তৈরী করেছে মা ?

সুন্দর-শরীর যুবকরা দল বেঁধে শিকার করতে চলেছে। পাহাড়ের কোলে ঝরনার ধারে চলতে চলতে তারা একজন আরেক জনকে জিগগেস করছে, এই সব পশু পাখি মানুষ জীব জন্তু কোথেকে এসেছে ভাই, কি করে বেঁচে আছে, আর মরবার পরই বা কোথায় যায়?

কোলের ছেলেকে আদর করতে করতে মা জিগগেস করছেন, খোকন আমার সোনা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? তোমাকে কে পাঠালে আমার কোলে?

সুন্দর খোকা এসব কিছুই বোঝে না। সে শুধু হাসে, মার কথায় শুধুই হাসে। বড়রা গরু মোষ ঘোড়া ছাগল চরাতে চরাতে আলোচনা করতে লাগলেন, সত্যিই খুড়ো, আমরা সব কোথেকে এসেছি? এই চন্দ্র সূর্য তারা আকাশ বাতাস এই বিশ্ব সংসার কোথেকে এসেছে? আমরা সবাই কি করেই বা বেঁচে আছি?

বুড়ো বুড়ীরা বলাবলি করতে লাগলেন, আর মরবার পরই বা মানুষ যায় কোথায়? আর মানুষ মরেই বা কেন?

মরণকে ভয় করে না, এমন প্রাণী নেই। বুড়োদের মনে এই ভয়টা আবার একটু বেশীই হয়। কারণ মরণের দিন যে সবার আগে তাদেরই ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যু শুধু কি বুড়োদেরই হয়? শিশু কিশোর যুবক সকলেরই হয়। বুড়ো বুড়ী কেউ মরলে তাতে আর্যদের মনে অতটা ভয় আসত না। কিন্তু যখন কোন যুবা বা শিশু মরণের আবেশে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ত, তার সারাটি দেহ একেবারে অসাড় ও ঠাণ্ডা হয়ে

যেত, তখনই তাঁরা ভয় পেতেন সব চাইতে বেশী। অজানা অশরীরী একটা দুরন্ত বাঘের মত মৃত্যু যে কখন কার ঘাড়ে এসে পড়বে, তা তাঁরা আগে থেকে কিছুই বুঝতে পারতেন না। জ্যান্ত বাঘের হাত থেকে বাঁচবার উপায় আছে, কিন্তু এই অদৃশ্য বাঘের হাত থেকে কি করে বাঁচা যায়? আর্যরা সত্যিই বড় ভাবিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা খুঁজতে লাগলেন এমন একটি বস্তু, যা পেলে মানুষ অমর হয়।

জানবার আকাংক্ষা মানুষের মনে স্বাভাবিক। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দেখা যায় অধিকাংশ সময়ই খেলার পুতুল ভেঙে দেয়। অমনি দুষ্টুমি করেই তারা ভাঙে না, তারা ভাঙে জানবার জন্যে পুতুলের মাঝে কি আছে তাই। আর্যরাও তখন নানা জনে নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন—বিশ্বের প্রত্যেকটি জিনিস জানতে,—সেগুলো কোত্থেকে এসেছে, কি করে আছে, আর শেষকালেই বা কোথায় যাবে, এই সব জানতে।

দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল। এভাবে বছরের পর অনেকগুলো বছরই কেটে গেল, কিন্তু কিছুই হল না। আর্যরা বুঝতে পারলেন, পৃথিবীর সামান্য একটা জিনিসকে জানতে গেলেও মানুষের জীবনে কুলবে না। আর অমর হবার কোন উপায়ই তাঁরা দেখতে পেলেন না।

খুব সুন্দর একখানি ছবি দেখলে আমরা কত খুশী হই। ছবিখানি দেখলেই আমরা বুঝতে পারি কেউ না কেউ নিশ্চয় এটি এঁকেছে। যার হাতের রেখা-কৌশলে ছবিখানার মোহন রূপ ফুটে উঠেছে, তাকে জানবার একটা ইচ্ছেও আমাদের মনে

হয়। আমরা জিগগেস করি, কে এঁকেছে এই সুন্দর ছবিখানি?

বিশ্বজগতের ছবি দেখে আর্যরা ভাবলেন, নিশ্চয়ই এই সুন্দরের কারিগর কেউ আছে। এত সুন্দর যাঁর হাতের রচনা, না জানি তিনি কতই সুন্দর।

তখন সবাই মিলে এই বিশ্ব-ছবির গোপন কারিগরকে খুঁজতে আরম্ভ করে দিলেন। তখন কারুর কারুর মনে হল, হয়তো তাঁকেই জানতে পারলে এ বিশ্বসংসারের সব কিছুই জানা হয়ে যাবে।

বুদ্ধিমানরা বললেন, বেশ বলেছ ভাই। আমরা তো দেখলুম একটা একটা করে সংসারের সব কিছু জানবার চেষ্টা করে, কিছুই জানা গেল না। এখন এমন যদি কোন বস্তুর খবর পাওয়া যায় যে সেটিকে জানলেই সব কিছু জানা হয়ে যায়, তাহলেই ঠিক হয়। তখন সবাই মিলে সেটিকে জানবারই বরং চেষ্টা করা যাবে।

সবাই তখন সেই চেষ্টায়ই লেগে গেলেন।

এভাবে কেটে গেল আরো কত বছর। সবার চোখে ধুলি দিয়ে কোথায় যে সেই অদ্ভুত বিশ্বশিল্পী লুকিয়ে রইলেন, কেউ তা খুঁজে বের করতে পারলেন না। তখন আর্যদের মাঝে যাঁরা ছিলেন খুব বুদ্ধিমান, তাঁদের মাঝে কেউ কেউ বললেন, এ রকম করে আমরা তাঁকে খুঁজে পাব না। পাবার হলে এতদিনে নিশ্চয়ই পেতুম। এস সবাই মিলে আমরা ধ্যান করি।

ধ্যান জিনিসটা কি? অন্য সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত মন দিয়ে একটি বিষয়ে গভীর চিন্তা করার নামই ধ্যান। শুধু ধার্মিক লোকেরাই যে ধ্যান করেন তা নয়, শিল্পীরা ধ্যানেই খুঁজে পান তাঁদের চিত্রের আসল রূপ, সাহিত্যিকরা খুঁজে পান তাঁদের গল্পের কাহিনী, তাঁদের কাব্যের রস, ব্যবসায়ীরা খুঁজে পান ধন পাবার পথ, চোর ডাকাতরাও খুঁজে পায় তাদের বাসনা পূরণের উপায়।

নির্জন পাহাড়ের কোলে নদীর ধারে পাথরের আসনে বসে আর্যদের কজন তাঁদের সমস্ত মন দিয়ে ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন। সারা দিন কেটে গেল। পরের দিন আবার তাঁরা ধ্যানে বসলেন। আবার সারা দিন কেটে গেল। কোনই আলো তাঁরা দেখতে পেলেন না। পরদিন আবার তাঁরা বসলেন। এভাবে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আর্যেরা কিছুতেই দমলেন না। একমনে তাঁরা চেষ্টা করে চললেন।

শেষকালে একদিন তাঁদের এ প্রাণপাত পরিশ্রম সফল হল। নিজেদের অন্তরে এক আশ্চর্য জ্যোতি তাঁরা দেখতে

পেলেন। ধ্যান তাঁদের সার্থক হল। চোখ মেলে তাঁরা চাইলেন। তাঁরা দেখলেন অগণিত আর্য নরনারী তাঁদের সামনে নীরবে বসে আছেন আকুল প্রতীক্ষায় কি তাঁরা দেখতে পান তাই জানবার জন্যে।

ধ্যানী আর্যদের মুখ এক স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই মুখ থেকে, তাঁদের সারা অংগ থেকে আনন্দ যেন উপচে পড়তে লাগল। আগন্তুক অগণিত জনমণ্ডলী এক মধুর আবেশে স্থির হয়ে চুপটি করে বসে রইলেন।

আর্যেরা বললেন, পেয়েছি, আমরা জেনেছি। ওগো, তোমরা শোন। বিশ্বের ছোট বড় যে যেখানে আছ, সবাই তোমরা শোন। তোমরা কেউ ছোট নও, কেউ হীন নও, সবাই তোমরা অমৃতের সন্তান।

ধ্যানী আর্যেরা আরও বলতে লাগলেন, অন্ধকারের পরপারে সূর্যের মত জ্যোতির্ময় এক মহান পুরুষের দেখা আমরা পেয়েছি। তাঁকে জানতে পারলেই অমর হওয়া যায়, আর কোন পথ নেই। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমরা জানতে পেরেছি।

আর্যদের মাঝে আনন্দের উৎসব লেগে গেল। সেদিনটি ছিল সারা বিশ্বজগতের সত্যিকারের উৎসবের দিন। কারণ বিশ্বের সব চাইতে কঠিন আর সব চাইতে বড় সত্য সেদিন আবিষ্কার হয়েছিল। যে কজন আর্য ধ্যান করে জ্যোতির দেখা পেয়েছিলেন, সবাই মিলে তাঁদের নাম দিলেন ঋষি। ঋষি শব্দের অর্থ যাঁরা সত্যকে দেখতে পান।

আর্যদেরই একটি শাখা পুবদিকে আসতে আসতে এই

বাংলা দেশে এসে বসবাস করেছিলেন। তখনকার দিনে খ্রীস্টান বা মুসলমান ধর্ম বলে কিছু ছিল না, এমন কি হিন্দুধর্ম নামেও কিছু ছিল না। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান, যে কোন ধর্মের লোক, অথবা যারা কোন ধর্মই মানে না, সব বাঙালীই আর্যদের সন্তান। বাঙালীরা ঋষির বংশধর, এর চাইতে বড় গৌরবের আমাদের আর কিছু নেই। এজন্যে যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, প্রত্যেক বাঙালীর মনেই ঋষিদের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে।

তারপরেও ঋষিরা ধ্যান করে আরও অনেক নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। তখনকার দিনে লেখাপড়ার প্রচলন না হওয়ায়, ঋষিরা তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যগুলো দিয়ে কোন বই লিখে যান নি। রামকৃষ্ণ চলে গেছেন। অথচ তিনি যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলো আমরা আজও ঠিক ঠিক জানতে পাই। তাঁর কথাগুলো দিয়ে বই ছাপা হয়েছে। সে বই যতকাল থাকবে; তত কালই লোক রামকৃষ্ণের উপদেশগুলো জানতে পারবে।

ঋষিরা যা পেলেন, পৃথিবীর মানুষের উপকারের জন্যে সেগুলো যে রেখে যাওয়া দরকার, ঋষিরা তাও অনুভব করলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা শেষকালে একটি পথ বের করলেন। এক একজন ঋষি এক এক দল ছাত্র নিলেন, আর তাদের বেদ শিক্ষা দিতে লাগলেন। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। ঋষিরা যে সব সত্য বা জ্ঞান আবিষ্কার করলেন, সেগুলোর নাম দিলেন তাঁরা বেদ। গুরুর মুখে শুনে শুনে

শিষ্যেরা বেদ শিখত। শিষ্যেরা বড় হয়ে আবার তাঁদের শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এ ভাবেই মুখে মুখে চলল বেদের প্রচার। শুনে শুনে শেখা হয় বলেই বেদের আরেক নাম শ্রুতি।

ঋষিরা যেভাবে কথা বলতেন, পোশাক পরতেন, ধর্ম করতেন, আমরা কেউই আর সে রকম করি নে। কালের সংগে সংগে সবই বদলে গেছে। আজ বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। আজ আর ছাত্রদের মুখে মুখে শিক্ষা দেবার দরকার হয় না। আজকাল বেদও ছাপা হচ্ছে।

হিমালয়ের কথা আমরা সবাই শুনি। পৃথিবীর মাঝে সব চাইতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ধ্যানী হিমালয় বিশ্বের কাছে ভারতকে গৌরবান্বিত করছে। হিমালয়ের দুর্গম শিখরে যাবার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু যখন আমি গংগার জলে হাত দিই, আমি তখন জলধারার মধ্য দিয়ে হিমালয়ের ধবধবে শৃংগগুলোর স্পর্শ পাই। গংগা ব্রহ্মপুত্র সিন্ধুর জলধারার ভেতর দিয়েই হিমগিরির যোগসূত্র রয়েছে।

আজ যখন আমি বেদ পড়ি, তখন বেদের কথাগুলোর ভেতর দিয়ে আমার হাজার হাজার বছরের আগেকার নাগাল না পাওয়া সেই জ্যোতির্ময় পূর্বপুরুষদের ছোঁওয়া আমি অনুভব করি। এই কথাগুলো তাঁরাই একদিন প্রচার করেছিলেন। অন্তরের গভীর শ্রদ্ধায় আমি তাঁদের নমস্কার করি।

মানুষ একটা কল তৈরী করতে পারে, একটি কবিতা রচনা করতে পারে, একটা গল্পও নিজের মন থেকে বানাতে পারে। কিন্তু জ্ঞান কেউ তৈরী করতে পারে না। আমরা জানি বা না

জানি, জগতে যত জ্ঞান আছে, চিরকালই সেগুলো ছিল এবং থাকবেও। ঋষিরা বলেন, জ্ঞান বা বেদ এসেছে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। ঋষিরা প্রথম যেদিন বেদ জেনেছিলেন, তার আগেও বেদ ছিল, আর ভবিষ্যতে যদি এমন দিন আসে, যখন সকলেই বেদ ভুলে যাবে, তাহলেও বেদ থাকবে। ঈশ্বরের যেমন আদি নেই, শেষ নেই, বেদেরও তেমনি আদি নেই, শেষ নেই।

অনেককাল পর ভারতে মস্ত বড় একজন ঋষি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যে অসাধারণ শক্তি বিদ্যা ও প্রতিভা তাঁর মাঝে দেখা গিয়েছিল, ভারতে কেন, সারা পৃথিবীতেই খুব কম লোকের মাঝে এরকম দেখা যায়। তাঁর নাম কৃষ্ণ। তাঁর বাবা পরাশর ছিলেন তখনকার দিনের খুব নামকরা একজন ঋষি। কিন্তু তাঁর মা ছিলেন এক জেলের মেয়ে, নাম সত্যবতী। কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল একটি দ্বীপে। তাই তাঁর নাম হল কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দেখলেন আমাদের বেদের আকার বিরাট আর অনেকটা এলোমেলোভাবেই এগুলো শেখা বা শেখানো হচ্ছে। বেদের আকার বিরাট, একথার মানে কি? জ্ঞানের তো কোন আকারই নেই। যার কোন আকার নেই সেটি বিরাট হয় কি করে? কথাটা একটু বুঝিয়ে বলছি। একজন ভাবুক পণ্ডিতের সামনে একদিন তাঁর বাবা মারা গেলেন। এ ঘটনায় তাঁর মনে বড় আঘাত লাগল। আপন মনে তিনি তখন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তিনি এক সময় তাঁর অন্তরে এক জ্ঞানের আলো দেখতে পেলেন। সে সত্য বা জ্ঞানটি হল এই—যে জন্মেছে একদিন না একদিন সে মরবেই।

এখন অন্যের কাছে যখনই তিনি তাঁর অনুভবের কথা বলতে চেষ্টা করবেন, তখনই তাঁকে কোন না কোন ভাষার আশ্রয় নিতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। আবার যে জ্ঞানটি তিনি পেলেন সেটি যদি মানবসমাজের জন্যে স্থায়ীভাবে রাখতে হয়, তাহলে ভাষার বাঁধনেই সেটিকে আটকে রাখতে হবে।

ঋষিরা যেসব সত্যের আবিষ্কার করলেন, কথার মালায় আবদ্ধ করেই সেগুলো তাঁরা শিক্ষা দিলেন তাঁদের শিষ্যদের মাঝে। আর এজন্যেই এতকাল পরে আজ আমি বেদের কথা বলতে পারছি। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ঋষিদের অনুভূত জ্ঞানগুলোর নাম বেদ, আবার যে শব্দগুলো দিয়ে ঐসব জ্ঞান বলা হয়েছে সেগুলোর নামও বেদ। কাজেই বেদের আকার বিরাট হতে কোনই বাধা নেই।

অনেক পরিশ্রম করে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সমস্ত বেদকে এক জায়গায় সংগ্রহ করলেন। তারপর তিনি করলেন বেদের চারটি ভাগ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব। বেদকে ভাগ করে সুশৃংখল করেছিলেন বলেই সেদিন থেকে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের আর একটি নাম হল বেদব্যাস।

তাঁর চারজন শিষ্যকে তিনি চারটি বেদ শিক্ষা দিলেন। পৈল শিখলেন ঋকবেদ, বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ, জৈমিনি সামবেদ এবং সুমন্ত শিখলেন অথর্ব বেদ। নিজের নিজের বেদ তাঁরা আবার তাঁদের শিষ্যদের শেখাতে আরম্ভ করলেন। এখনও এদেশের ব্রাহ্মণকে জিগগেস করলে কেউ বলেন আমার যজুর্বেদ, আবার কেউ বলেন আমার সামবেদ।

প্রত্যেক বেদের আবার দুটো করে ভাগ আছে। একটির নাম মন্ত্র বা সংহিতা, অন্যটির নাম ব্রাহ্মণ। সংহিতায় সাধারণত নানা রকম যাগযজ্ঞের কথা, নানা আচার নিয়মের কথা আছে। আর ব্রাহ্মণ ভাগে আছে সংহিতার ব্যাখ্যা, পরমেশ্বরের স্তব, নানা তত্ত্বকথা প্রভৃতি।

উপনিষদ হয়েছে বেদের সার। এজন্যেই এর আর একটি নাম বেদান্ত। উপনিষদ শব্দের অর্থ—যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে পায় এবং যে বিদ্যা জানলে মানুষের কোন রকম পরাধীনতার বাঁধন থাকে না, সে অখণ্ড স্বাধীনতা লাভ করে।

উপনিষদ আছে অনেকগুলো। ধর্মের যত ছোট বড় সত্য আজ পর্যন্ত জগতে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার প্রায় সবই বেদে আছে। একই সত্য দেশ, মানুষ, আর সময় বিবেচনা করে এক একজন মহাপুরুষ এক এক ভাবে প্রচার করেছেন।

উপনিষদে অনেকগুলো গল্প আছে। শিষ্যদের কঠিন কঠিন জ্ঞানের কথা বোঝাবার জন্যে গুরুরা এই সব গল্প বলতেন। তখনকার দিনের গল্প বলার ঢং কি রকম ছিল, এইগুলো থেকে আমরা তারও কিছু কিছু অনুমান করতে পারি।

দিল্লীর বাদশা সাজাহানের ছেলে দারা ফারসীতে উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন। জার্মানীর মস্ত বড় পণ্ডিত শোপেন-হাওআর তাই পড়ে আর্যদের জ্ঞান দেখে অবাক হয়েছিলেন। এবং তাই থেকে অনেক শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন। এটি সত্যিই গৌরবের কথা।

অপরূপ

এক সময়ে দেবতা ও অসুরদের মাঝে একটা ভয়ংকর রকম লড়াই হয়েছিল। অসুররা দেবতাদের সংগে পেরে উঠত না। কিন্তু সে বারে হল ঠিক তার উলটো। অসুররা দেবতাদের এমনভাবে চেপে ধরলে যে কোন মতেই তাঁদের জয়ের আশা রইল না।

দেবতারা ভাল আর অসুররা খারাপ, একথা তো সবাই জানে। দেবতারা চান পৃথিবীর ভাল হোক। অসুররা তা চায় না। তারা শুধু নিজের সুখ সুবিধেই চায়। নিজের সুখ সুবিধের জন্যে তারা অন্যদের ওপর অন্যায় ভাবে নানা রকম অত্যাচার ও উৎপাত করত। অসুররা জয়ী হলে পৃথিবীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হত।

দেবতা ও অসুর সকলের ওপরেই আছেন পরমেশ্বর। তিনি সকলের চাইতে বড়। তিনিই তো এই বিশ্ব সংসার সব সৃষ্টি করেছেন। লড়াইএর এই অবস্থা দেখে পরমেশ্বর একটু ভাবিত হলেন। তাঁর ইচ্ছে নয় যে অসুররা জয়ী হয়। শেষ কালে তিনি এক যুক্তি করলেন। অদৃশ্য থেকে দেবতাদের মাঝে শক্তি দিতে লাগলেন।

শক্তিমানরাই তো জয়ী হয় আর দুর্বলরাই পরাজিত হয় সব সময়। পরমেশ্বরের শক্তি পেয়ে দেবতাদের শক্তি অসুরদের চাইতে অনেক বেশী হয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই অসুররা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল।

জয়লাভের পর দেবতাদের মনে হল ভারী আনন্দ। তাঁরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উৎসব করতে লাগলেন। অত্যন্ত প্রতাপশালী শত্রুদের পরাস্ত করেছেন বলে তাঁদের মনে অহংকারেরও শেষ ছিল না।

পরমেশ্বর পেছনে থেকে সবই দেখছেন। দেবতারা তো পরাজিত হতেই চলেছিলেন। তিনি শক্তি না দিলে কখনও তাঁরা জয়ী হতে পারতেন না। দেবতাদের মনে যে অহংকার হয়েছে, তা ভাঙবার জন্যে তিনি মনে মনে এক উপায় ঠিক করলেন।

পরমেশ্বরের কোন রূপই নেই। অথচ জগতের যা কিছু তাঁর ভেতর থেকেই এসেছে। রূপ না থাকলেও তিনি ইচ্ছেমত রূপ ধরতে পারেন। কারণ সব কিছু করবার শক্তিই তাঁর আছে। দেবতারা সবাই মিলে যেখানটায় উৎসব করছেন, খুব মনোহর রূপ ধরে তিনি তার কাছে একটা জায়গায় গিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উৎসব-আনন্দে মাতোয়ারা দেবতারা হঠাৎ এই অপরূপ মূর্তিটি দেখে একেবারেই অবাক হয়ে গেলেন। একজন অন্যজনকে জিগগেস করতে লাগলেন, কে ভাই উনি?

কিন্তু কেউ তার জবাব দিতে পারলে না।

শেষকালে সবাই ধরে বসল অগ্নিকে। অগ্নি হলেন আগুনের দেবতা। তাঁর শক্তিতেই আগুন জ্বলে। সবাই বললে, অগ্নি, আপনি হলেন আমাদের মধ্যে অসীম শক্তিমান। ঐ সুন্দর মূর্তিটি কে, আমরা মনে করি আপনি গেলেই সহজে জেনে আসতে পারবেন।

বুক ফুলিয়ে চললেন অগ্নি। সত্যিই তো, দেবতাদের মাঝে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি। এই জন্যেই তো সবাই মিলে তাঁকেই আগে পাঠালে। কিন্তু যতই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, একটা অজানা আশংকায় বুকটি তাঁর দুরু দুরু করে উঠছে।

অগ্নি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেই মূর্তি গম্ভীর স্বরে জিগগেস করে বসলেন, কে তুমি ?

অগ্নি জবাব দিলেন, আমার নাম অগ্নি। কেউ কেউ আমাকে জাতবেদা বলেও ডাকে।

— কি করতে পার তুমি ? আবার সেই গম্ভীর প্রশ্ন।

—কি করতে পারি ? পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আমি পুড়িয়ে দিতে পারি। আমার হাত থেকে কারুরই বাঁচবার উপায় নেই।

মূর্তিটি বললেন, বটে। আচ্ছা, আমার কাছে একগাছি শুকনো ঘাস আছে। তুমি তা পুড়িয়ে দিতে পারবে ?

অগ্নি মনে মনে বললেন, মস্ত মস্ত পাহাড়ই পুড়িয়ে ছাই করে দিই, আর এই ছোট্ট ঘাসটুকু। মূর্তিকে বললেন, হ্যাঁ, আমি পারি বই কি ?

ঘাসটি এগিয়ে দিয়ে মূর্তি বললেন, বেশ, দাও তো পুড়িয়ে।

অগ্নি চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। তখন আরও বেশী জোর দিয়ে চেষ্টা করলেন, তাতেও হল না। শেষকালে তাঁর সবটুকু শক্তি নিঃশেষ করে দিয়ে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘাসের ডগাটিও পোড়াতে পারলেন না।

মুখখানি অন্ধকার করে অগ্নি ফিরে গেলেন দেবতাদের

মাঝে। সবাই জিগগেস করতে লাগল, কি হল ভাই? কে উনি? কিছু জানতে পারলে?

মাথা নিচু করে অগ্নি জবাব দিলেন, না, আমি কিছুই জানতে পারলুম না।

তখন সবাই চেপে ধরলে বায়ুকে। বললে, আপনার অসীম ক্ষমতা। যেখানে কেউ যেতে পারে না, আপনি সেখানে সহজেই চলে যান। আপনি গেলে নিশ্চয়ই জেনে আসতে পারবেন উনি কে।

চললেন বায়ু। একটা অজানা আশংকায় তাঁর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। কাছে যেতেই সেই সুন্দর মূর্তিটি প্রশ্ন করলেন, কে তুমি?

বায়ু জবাব দিলেন, আমি বায়ু। অনেকে আমাকে মাতরিশ্বা বলেও ডাকে।

—তোমার কি শক্তি?

—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আমি উড়িয়ে দিতে পারি।

—আচ্ছা, এই ঘাসটুকু উড়িয়ে নিয়ে যাও দেখি।

আগের ঐ ঘাসটি তিনি বায়ুর সামনে রাখলেন।

বায়ু চেষ্টা করলেন। অগ্নির মত সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি চেষ্টা করলেন, আবার অগ্নিরই মত বিফল হয়ে ফিরে গেলেন দেবতাদের মাঝে।

দেবতাদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে তাঁরা জিগগেস করতে লাগলেন, কি হল? কিছু জানতে পারা গেল?

মাথা হেঁট করে বায়ু জবাব দিলেন, না।

দেবতাদের মাঝে মহা ভাবনা দেখা দিলে। কি করা যায়? শেষকালে অনেক যুক্তি পরামর্শ করে তাঁরা সবাই মিলে ইন্দ্রকে গিয়ে ধরলেন, ইন্দ্র, আপনি আমাদের রাজা, আপনার শক্তির তুলনা নেই। আপনি গেলে নিশ্চয়ই জেনে আসতে পারবেন ওই অপরূপ মূর্তিটি কে?

ইন্দ্রকে তখন যেতেই হল। কাছাকাছি যেতে না যেতেই সেই মূর্তিটি কোথায় মিলিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে ইন্দ্র সেখানে থম্‌কে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই সময় হৈমবতী উমা ধীরে ধীরে আকাশপথে নেবে এলেন। উমার গায়ের রং সোনার মত আর কত সুন্দর সুন্দর অলংকার পরেছেন তিনি। ইন্দ্র শেষকালে উমাকেই

জিগগেস করলেন, এই একটু আগেই যে অপূর্ব মূর্তিটি এখানে ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন, তিনি কে ?

উমা জবাব দিলেন, তিনি পরমেশ্বর। এই বিশ্বের যেখানে যা আছে তিনিই সব করেছেন, আর তাঁর শক্তিতেই সব চলছে। তাঁর শক্তি পেয়েই তোমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছ। অথচ নিজেদের বাহাত্বরি হয়েছে মনে করে অহংকারে নাচতে আরম্ভ করেছ। তোমাদের অহংকার ভাঙবার জন্যেই তিনি এভাবে রূপ ধরে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

শক্তিমানের কাছে যারা যায়, তারাও শক্তিমান হয়। মহতের সংস্পর্শে যারা আসে, তারাও মহত্ব পায়। শোনা যায় পরমেশ্বরের কাছাকাছি গিয়েছিলেন বলে অগ্নি আর বায়ু অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় বেশী শক্তিমান হয়েছিলেন। আর সবার আগে ইন্দ্র তাঁকে জানতে পেরেছিলেন, তাই ইন্দ্র হলেন দেবতাদের মধ্যে সবার চাইতে বড়।

বিশ্বদেবতা

ঋষিরা ধ্যানে বসে এক জ্যোতির্ময় বিরাট পুরুষের দেখা পেয়েছিলেন। তাঁর কোন আকার নেই অথচ তাঁকে দেখা যায়। তাঁর আদি নেই অন্ত নেই, অথচ তিনি সব জায়গায়ই আছেন। ঋষিরা তাঁর নাম দিলেন ব্রহ্ম।

পাঁচজন ঋষির পাঁচটি ছেলে—প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ,

ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন ও বুড়িল—একদিন বসে নিজেদের মাঝে বিচার করতে লাগলেন,—ব্রহ্ম কি ? এঁদের সকলেই ছিলেন মহা বিদ্বান। অনেকক্ষণ ধরে বিচার হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। তখন জন বললেন, ভাই, এরকম করে আমরা ব্রহ্মকে জানতে পারব না। চল আমরা উদ্দালক ঋষির কাছে যাই। আমি শুনেছি তিনি নাকি এক বিশ্বদেবতার উপাসনা করেন।

সবাই চললেন উদ্দালকের কাছে। যাবার পথে সকলেই জংগল থেকে এক এক আঁটি জ্বালানী কাঠ হাতে নিয়ে চললেন। এটিই ছিল তখনকার দিনের নিয়ম। প্রত্যেক নিয়মেরই একটি অর্থ থাকে। গুরুর বশ্যতা স্বীকার না করলে সত্যিকার বিদ্যালাভ হয় না। আবার শিষ্যেরা গুরুর সেবা করতে আনন্দ পান। জ্বালানী কাঠ হাতে গুরুর কাছে যাবার অর্থ—গুরুর অধীন হওয়া আর গুরুর সেবার জন্যে তৈরী হওয়া।

ঋষিরা রাতদিনই কাছে আগুন রাখতেন। তাঁদের তাই অনেক কাঠের প্রয়োজন হত। আর সমস্ত কাঠই শিষ্যেরা জংগল থেকে কেটে আনতেন।

ঋষিকুমারদের এভাবে আসতে দেখে উদ্দালক সবই বুঝতে পারলেন। কিন্তু এঁদের তিনি কি শিক্ষা দেবেন ? তিনি যে তখনও ব্রহ্মকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে পারেন নি। ঋষি-কুমাররা আসতেই তিনি বললেন, আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন আমি তা বুঝতে পেরেছি। আপনাদের শিক্ষা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কেকয় দেশের রাজা অশ্বপতির

কাছে আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। তিনিই আপনাদের সব কথা শিখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

সবাই চললেন অশ্বপতি রাজার কাছে। রাজা হলেও অশ্বপতি ছিলেন ঋষিদের মতই জ্ঞানী। ব্রহ্মকে তিনি জানতে পেরেছিলেন। উদ্দালক ও পাঁচজন ঋষিকুমারকে রাজা খুব যত্ন করে স্থান দিলেন।

ঠিক সে সময় অশ্বপতি একটি বিরাট যজ্ঞ করবার আয়োজন করছিলেন। এক এক দেশের লোক এক এক-ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে। কেউ করে প্রার্থনা, কেউ পড়ে নমাজ, আবার কেউ ফুল ফল দিয়ে করে পুজো। উপাসনার উৎসব আড়ম্বরও এক এক দেশে এক এক রকমের হয়। আবার আজকাল যে রকম হয় হাজার হাজার বছর আগে ঠিক সে রকমটি হত না। যখনকার কথা বলছি, তখনকার দিনে যজ্ঞ ছিল এক রকমের উপাসনা।

মাটির বেদী তৈরী করে তাতে কত রংবেরঙের আলপনা যে আঁকা হত, কত রকমের বেদী আর কত রকমের আলপনা যে হত তার সীমা নেই। আবার তাতে কত ভাবের সূক্ষ্ম কারুকার্যই না করা হত! তখনও জ্যামিতির আবিষ্কার হয় নি। কিন্তু আর্যদের বেদী ও আলপনা রচনার কৌশল দেখলে মনে হয় যেন জ্যামিতির কঠিন কঠিন ছবিগুলো আঁকবার নিয়মও তাঁরা ভাল করেই জানতেন। আগুনকে তাঁরা বড় পবিত্র মনে করতেন। যত পুজো সব তাঁরা আগুনের হাতে দিতেন পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। এরই নাম যজ্ঞ।

যেসব পুরুতেরা যজ্ঞ করতেন তাঁদের নাম ছিল হোতা। যজ্ঞবেদীর চারদিকে বসে সুর করে মন্ত্র বলে হোতারা আগুনের মাঝে ঘি, যব আর তখনকার দিনের ভাল ভাল খাবার, পায়েস, পিঠে সব একটি একটি করে ঢেলে দিতেন। কাছে বসে ব্রাহ্মণরা সকলে সমস্বরে বেদগান করতেন। যজ্ঞ-বাড়ির আর এক পাশে বসত ঋষিদের সভা। সেখানে বেদের কথা, পরমেশ্বরের কথা, সব বিচার ও আলোচনা হত। রাজারা আর রাজ্যের যত বড় বড় বিদ্বান লোক সব সেখানে বসে ঋষিদের আলোচনা শুনতেন। রাজারা দুহাতে ধনদৌলত আর হাজার হাজার গরু দান করতেন গরিব, দুঃখী ও ব্রাহ্মণদের মাঝে। অভ্যাগতেরা নিত্যই পেট ভরে নানা রকম খাবার পেত। আমোদ আহ্লাদে, গানবাজনায়, উৎসব আনন্দে যজ্ঞবাড়ি গম গম করত।

রাজা অশ্বপতি পরদিন সকালে ঋষিকুমারদের কাছে গিয়ে বললেন, আমার পরম ভাগ্য যে এ সময় আপনারা আমার বাড়ি এসেছেন। আমি একটি যজ্ঞের আয়োজন করছি। যতদিন না আমার যজ্ঞ শেষ হয়, ততদিন আপনারা এখানে সুখে বাস করুন। যজ্ঞের সময় প্রত্যেক হোতাকে আমি যত ধন রত্ন দেব, আপনাদের প্রত্যেককেও আমি তাই দেব।

ঋষিকুমারেরা উত্তর করলেন, ধনরত্নের জন্যে আমরা আপনার কাছে আসি নি। আপনি বিশ্বদেবতা ব্রহ্মের কথা জানেন। আপনার কাছে তাই আমরা শিখতে এসেছি। দয়া করে আপনি আমাদের কাছে ব্রহ্মের কথা বলুন।

টাকা পয়সার দিকে যতদিন মানুষের লোভ থাকে ততদিন সে সত্যিকারভাবে ভগবানের পথে যেতে পারে না। ঋষি-কুমারদের কথায় রাজা বড় খুশী হলেন। বললেন, বেশ কথা, কালই আমি আপনাদের কাছে ব্রহ্মের কথা বলব।

পরদিন ভোর হতে না হতেই ঋষিকুমারেরা সকলে যজ্ঞের কাঠ হাতে রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। একজন একজন করে রাজা প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে উপাসনা করেন?

প্রাচীনশাল সবার আগে উত্তর করলেন, আমি স্বর্গকেই ব্রহ্ম বলে উপাসনা করি।

সত্যযজ্ঞ বললেন, আমি সূর্যের মাঝে ব্রহ্মের উপাসনা করি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, আমি করি আকাশে।

জন বললেন, আমি বায়ুতে।

বুড়িল বললেন, আমি জলে।

সবার শেষে উদ্দালক উত্তর করলেন, আমি এ পৃথিবীর মাঝেই ব্রহ্মের উপাসনা করি।

অশ্বপতি সকলের কথাই শুনলেন। বিরাট পুরুষ ব্রহ্মের কোন আকার নেই। তাই তাঁর চিন্তা করা বড় কঠিন। বিরাট কিছুর চিন্তা করতে গেলেই সাগর বা আকাশের ছবিই আমাদের মনে ভেসে ওঠে। জ্যোতির্ময়ের চিন্তা করতে গেলে সূর্যের কথা মনে আসাই স্বাভাবিক।

অশ্বপতি বললেন, আপনাদের উপাসনা ভুল হচ্ছে একথা

আমি বলি নে। আপনারা ঠিকই করছেন। তবে আপনাদের সকলকেই আরও এগিয়ে যেতে হবে। পৃথিবী সাগর আকাশ বাতাস কিছুই ব্রহ্ম নয়, অথচ এ সকলের মাঝেই তিনি রয়েছেন। তিনি বিশ্বদেবতা, এ বিরাট বিশ্ব তাঁরই একটি রূপ।

অশ্বপতি অতি সুন্দর করে ঋষিকুমারদের কাছে বিশ্বদেবতার কথা বললেন। সে সব কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে লেখা আছে।

ঋষিকুমাররা বাড়ি ফিরে গেলেন।

কে বড়

চোখ কান বাক মন ও প্রাণের মাঝে একদিন লেগে গেল ভয়ানক ঝগড়া। কে বড়, এটিই হল তাদের বিবাদের কারণ। প্রত্যেকেই বলে আমি বড়, তোমরা সব ছোট। কিছুতেই আর মীমাংসা হয় না।

শেষকালে সবাই গিয়ে হাজির হল আদিপুরুষ প্রজাপতির কাছে। বললে, আমাদের মাঝে সত্যি সত্যি কে বড়, তুমি বিচার করে দাও।

এদের মুখ থেকে প্রজাপতি একে একে সব কথা শুনে নিলেন। তিনি পড়লেন মহা বিপদে। যাকে তিনি বড় বলবেন, সে ছাড়া আর সবাই তাঁর ওপর ভয়ানক চটে যাবে।

কাউকে না চটিয়ে যদি কাজটি আদায় করা যায়, তা হলেই তো ভাল। বুদ্ধি করে শেষ কালে তিনি বললেন, তোমাদের এ বিবাদে আমি আর কি বিচার করব? তোমরা নিজেরাই এর মীমাংসা করে নাও।

বাক্যবীর বাক সকলের আগেই জবাব দিলেন, না প্রজাপতি, তুমি আমাদের অবস্থা বুঝতে পারছ না। অনেক চেষ্টা করেও আমাদের কোন মীমাংসা হয় নি। তুমিই বিচার করে দাও।

প্রজাপতি বললেন, আমার বিচার তোমরা সবাই মেনে নেবে তো?

—নিশ্চয়, এক শ বার। এক সংগে সবাই বলে উঠল।

প্রজাপতি বললেন, আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের মাঝে যে চলে গেলে শরীরের অবস্থা সব চাইতে বেশী খারাপ হবে, সেই তোমাদের মধ্যে বড়।

প্রজাপতির কথা সবাই মেনে নিলে।

বাক-এর মনে ছিল সব চাইতে বেশী অহংকার। যে যন্ত্র দিয়ে আমরা কথা বলি, তার নামই বাক। সবার আগে বাকই চলে গেল শরীর ছেড়ে। এক বছর পর ফিরে এসে শরীরকে বললে, কেমন ভায়া, কি খবর?

শরীর বললে, খবর সব ভালই।

শরীরের জবাব শুনে বাক তো চটে লাল। বললে, ভালই মানে? আমি তো এক বছর ছিলুম না। সেই সময় ছিলে কেমন?

শরীর জবাব দিলে, তা দাদা, এক রকম ভালই ছিলুম বলতে

হবে বই কি? কথাটা বলতে পারি নি শুধু। আর সবই তো ঠিক ছিল। বোবারা যেমন থাকে, সে রকমই ছিলুম আর কি?

শরীরের কথা শুনে বাক মোটেই খুশী হল না, একটু যেন মনমরা হয়ে গেল। তারপর চুপটি করে শরীরের ভেতর গিয়ে নিজের কাজে মন দিলে।

চোখ বললে, বাক যে বড় নয়, সেকথা তো আমি গোড়াতেই বলেছি। এই আমি যাচ্ছি। এবার বুঝতে পারবে কে বড়।

চোখ চলে গেল।

এক বছর পর সেও ফিরে এল। সে ভেবেছিল এসে দেখবে শরীরের অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে গেছে। কিন্তু সেরকম কিছু না দেখে একটু যেন দমে গেল। তবুও জিগগেস করলে শরীরকে, কেমন ছিলে ভাই এই একটি বছর?

শরীর জবাব দিলে, মন্দ কি ভাই। অন্ধেরা যেমন থাকে, আমিও সেভাবে ছিলুম। বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি আমার।

চোখের পর গেল কান। সেও এক বছর পর ফিরে এসে শরীরকে জিগগেস করলে। শরীর বললে, ছিলুম মোটামুটি ভালই। কালারা যেমন থাকে, আমিও সে রকমই ছিলুম।

কানের পর গেল মন। মন ভাবলে আমি গেলে শরীর কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। তাহলে আমিই যে সব চাইতে বড়, এ কথা সবাই বুঝতে পারবে।

এক বছর পর ফিরে এসে শরীরকে বেশ সতেজ দেখে মন তো একেবারে অবাক। শরীর বললে, ভাই, ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরা যেমন থাকে, এই এক বছর আমিও সে রকমই কাটিয়েছি। খুব বেশী কষ্ট হয় নি।

সকলের পরীক্ষাই হয়ে গেছে। এবার প্রাণের পালা। বাক চোখ কান ও মনকে ডেকে তখন সে বললে; তোমরা তো ভাই একে একে সবাই ঘুরে এসেছ। আমি এবার যাই।

প্রাণ তখন শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বেরিয়ে আর যেতে হল না। চেষ্টার সংগে সংগেই শরীরের সমস্ত কাজ একসংগে বন্ধ হয়ে যাবার মত হল। বাক চোখ কান, এমন কি মনের কাজ পর্যন্তও তখন বন্ধ হয় হয়। সবাই চীৎকার করে বলে উঠল, ও-ভাই প্রাণ, তুমিই সবার বড়। তুমি যেও না। তুমি গেলে আমাদের আর কেউ বাঁচবে না।

ভৃগু

অনেক হাজার বছর আগেকার একটি কিশোরের গল্প বলছি। কিশোরটির নাম ভৃগু। খুব ছেলে বয়সেই তখনকার ছেলেরা গুরুর কাছে গিয়ে বেদ শিখত। ভৃগুর তখন বেদ পাঠ শেষ হয়েছে। বেদেতে ব্রহ্মের কথা আছে। বালক ভৃগুর মনে ইচ্ছে হল ব্রহ্ম কি, তাই জানতে হবে।

জানবার আকাংক্ষা সকলের সমান থাকে না। জানবার আকাংক্ষা অন্তরে যার খুব প্রবল, আর জানবার জন্যে যে প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেই তো বড় হয়। ভৃগুর মত কত লক্ষ কোটি বালক ভারতের বুকে এসেছে, আবার চলে গেছে। কে

তার খবর রাখে। অথচ ভৃগুর কথা আজও আমরা মনে করছি কেন ?

ভৃগু তার গুরুকে বললে, গুরুদেব, ব্রহ্মের কথা বেদে তো পড়লুম। আমি সেই ব্রহ্মকে জানতে চাই। আপনি আমাকে তার উপায় বলে দিন।

বালকের কথায় গুরু প্রথম খুবই আশ্চর্য হলেন। প্রতিভায় উজ্জ্বল তার মুখখানির দিকে চেয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, এ

বালক সত্যিই একদিন নামকরা লোক হবে। ভৃগুর মাথায় হাত দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করলেন, বললেন, বাবা, তোমার প্রশ্ন শুনে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। তোমার বেদ পাঠ শেষ হয়েছে। তুমি এবার বাড়ি ফিরে যাও। তোমার বাবা একজন বড় ঋষি। তাঁর কাছ থেকেই তুমি ব্রহ্মকে জানবার উপায় জানতে পারবে। আমি আশীর্বাদ করি তোমার জীবন গৌরবময় হোক।

গুরুর পদধূলি মাথায় নিয়ে ভৃগু বাড়ি ফিরে এল।

ভৃগুর বাবার নাম বরুণ। বরুণ ছিলেন সে সময়ের একজন খুব নামকরা ঋষি। একদিন ভৃগু তার বাবার কাছে গিয়ে

বললে, বাবা, আমি ব্রহ্মকে জানতে চাই। গুরুদেব বললেন, তুমি নাকি আমাকে জানবার উপায় বলে দিতে পারবে।

ছেলের কথায় বাবার মনে খুব আনন্দ হল। একটু সময় তিনি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, বাবা, ব্রহ্মকে জানতে হলে খুব একাগ্র মনে তপস্যা করতে হয়।

তিনি বললেন, যাই থেকে এই বিশ্বের সব প্রাণী উৎপন্ন হয়েছে, যার জন্যে বাড়ছে, এবং শেষকালে মরবার পর যাতে গিয়ে মিশে যায়, তিনিই ব্রহ্ম। তপস্যা করে তুমি এই ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা কর।

এক মনে ভৃগু তপস্যা করতে লাগল।

তপস্যা বলতে আমরা মনে করি উপোস করা, খুব কষ্ট করে থাকা, অনেক রকম করে শরীরকে কষ্ট দেওয়া, এই সব। কিন্তু সত্যিকার তপস্যা তা নয়। কোন কিছু জানবার, করবার অথবা আয়ত্তে আনবার জন্যে মানুষ অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে রাতদিন যখন একমনে চেষ্টা করতে থাকে, তাকেই বলে সত্যিকার তপস্যা।

সাধু সন্ন্যাসীরাই যে শুধু তপস্যা করেন তা নয়। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের জন্যে, গাইয়ে বাজিয়েরা সংগীতের সুরতালকে আয়ত্তে আনবার জন্যে, ছাত্রেরা বিদ্যা শিখবার জন্যে একান্ত ভাবে যে চেষ্টা করেন, তার নামও তপস্যা।

অনেক কাল তপস্যা করার পর ভৃগু তার বাবার কাছে ফিরে এল। বললে, বাবা, আমি ব্রহ্মকে জেনেছি। অন্নই

ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই তো সকলের জন্ম, অন্নেতেই বাড়ছে, আবার শেষকালে অন্নেতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বাবা জবাব দিলেন, না, তপস্যা কর। তপস্যা করে ব্রহ্মকে জান।

ভাতকে সংস্কৃত কথায় বলে অন্ন। খাবার সমস্ত জিনিসকেও অন্ন বলা হয়। কিন্তু এখানে যে অন্নের কথা বলা হয়েছে, সেটি ভাতও নয় খাবারও নয়। মাটি জল বাতাস আলো আকাশ, এইগুলো থেকেই তো আমাদের শরীর তৈরী হয়েছে, এগুলোতেই বাড়ছে, আবার মরবার পর আমাদের শরীর এগুলোর মাঝেই মিশে যায়। এগুলোকেই অন্ন বলা হয়েছে।

ভৃগু আবার তপস্যা করতে লাগল। কিছুদিন পরেই ভৃগু বুঝতে পারলে যে অন্ন কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না। কারণ অন্নের যে উৎপত্তি আছে, বিনাশও আছে। ব্রহ্মের তো উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। তাহলে ব্রহ্ম কি?

কিছুদিন পর আবার তার বাবার কাছে উপস্থিত হয়ে ভৃগু বললে, বাবা, আমি ব্রহ্মকে জেনেছি। মনই ব্রহ্ম। মন থেকেই প্রাণীরা সব জন্মেছে, মনের জন্যেই বাড়ছে, আবার মনের মাঝেই মিশে যাচ্ছে।

বরুণ বললেন, না। তপস্যা কর।

ভৃগু আবার তপস্যা করতে লাগল। পেছনে যদি মন না থাকে, তা হলে কোন কাজই হতে পারে না। মানুষ জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, মরে যাচ্ছে, এ সবই এক এক রকমের কাজ। সুতরাং মন থেকেই এগুলো হচ্ছে।

ভৃগু বুঝতে পারলে যে, মন কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না। কারণ মনের যে পরিবর্তন হচ্ছে। ব্রহ্মের তো পরিবর্তন হয় না। তা হলে ব্রহ্ম কি ?

আবার তপস্যা চলল।

ভৃগু দেখলে আমাদের প্রত্যেক সুখ দুঃখ, বাঁচা মরা সবার মূলেই রয়েছে অনুভূতি। অনুভব করি বলেই তো বেঁচে আছি। যদি অনুভব না করতুম, তা হলে মরা বাঁচার কোন অর্থই থাকে না। ভৃগু ভাবলে, তাহলে এই অনুভূতিই ব্রহ্ম। সে তার বাবার কাছে গিয়ে বললে, বাবা, অনুভূতিই কি ব্রহ্ম ? কারণ এই অনুভূতি থেকেই তো—

বলতে গিয়েও ভৃগু থেমে গেল মাঝখানে।

বাবা বললেন, না তপস্যা কর।

ভৃগু বুঝতে পারলে অনুভবেও কমবেশী হয়। ব্রহ্মের তো কখনও কমবেশী হয় না। সে আবার তপস্যা করতে লাগল।

অনেক কাল পরে ভৃগুর তপস্যা সফল হল। সে এক আনন্দময় জ্ঞানের পরিচয় পেলে তার অন্তরের মধ্যে। ভৃগুর সমস্ত অন্তর সমস্ত সত্ত্বা এক সংগে বলে উঠল, এটিই ব্রহ্ম, এটিই ব্রহ্ম।

বালাকি

বালাকির কথার জ্বালায় সবাই অস্থির হয়ে উঠত। বয়স তার বেশী নয়। কিন্তু তার মুখের পাকা পাকা কথা একবার যে শুনত, সে আর কখনও তার কাছে ঘেঁষতে চাইত না। মনে ছিল তার দারুণ অহংকার। সে ভাবত, আমার মত জ্ঞানী লোক আর কেউ নেই। সবাই এজন্যে আমাকে ভয় করে চলে, কাছে আসতে চায় না।

বেদ পড়া শেষ হবার পর তার বোল চাল গেল আরও বেড়ে। যাকে যেখানে পেত, তার কাছেই নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে উঠত। শেষকালে অহংকারের তার এত বাড়াবাড়ি হল যে তা বলবার নয়।

সে ভাবলে, ঋষিদের পাড়ায় তার কথা বোঝবার মত কে আছে। কোন বড় লোক বা রাজা রাজড়ার কাছে গিয়ে তাঁকে ধর্মশিক্ষা দেওয়াই তার কর্তব্য।

শেষকালে সে কাশীর রাজা অজাতশত্রুর সভায় গিয়ে উপস্থিত হল। ঋষিকুমার দেখে রাজা খুব সমাদর করলেন। বালাকি ভাবলে, ধর্ম উপদেশ দেবার আগেই এত আদর, তা হলে রাজা দেখছি লোক ভাল, আর উপদেশ দিতে আরম্ভ করলে আমাকে অনেক বেশী আদর করবেন নিশ্চয়ই।

বালাকি বললে, রাজা, আমি আপনাকে ব্রহ্ম উপদেশ করব।

রাজা বললেন, উত্তম।

বালাকির কথা শুনে আর চেহারা দেখেই রাজা সব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ঠাট্টা করে বললেন, কুমার, আমি আপনাকে এক হাজারটি গাই উপহার দেব। সবাই বলে জনক রাজা বড় দাতা। আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে জনকের চাইতে দাতা আমি বড় কম নই।

বালাকির মনে খুব আনন্দ। ভাবলে, তবুও তো এখনও উপদেশ দিই নি। আগেই এত, তাহলে পরে না-জানি কত হবে। কত সম্মান ও কত উপহার আমি পাব।

বালাকি বললে, রাজা, তাহলে আর দেরি করে লাভ কি? আসুন, এখনই আমি আপনাকে ব্রহ্মের বিষয়টি শিখিয়ে দিই।

রাজা উত্তর করলেন, নিশ্চয়, এখনই আরম্ভ করা যাক।

—জানেন রাজা, বালাকি গম্ভীর ভাবে বলতে লাগল, জানেন রাজা, আমার মত আপনাকে এ বিদ্যে আর কেউ শিখিয়ে দিতে পারবে না।

এ কথায় হাসি আর চেপে রাখতে পারলেন না রাজা। বললেন, সে আমি আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।

—আপনাকেই আমি আমার বড় শিষ্য করব। বালাকি বললে।

হেসে জবাব দিলেন রাজা, আহা, আমার কি ভাগ্য।

তারপর বালাকি একে একে ব্রহ্মের কথা বলতে আরম্ভ করলে। খানিকটা বলতেই রাজা বলেন, এ কথাটি আমারও

জানা আছে কুমার। আপনি যা বললেন তা ঠিক নয়। তাতে এই এই ভুল হয়েছে, ঠিক কথাটি এ রকম হবে।

বালাকি যা বলতে পারে নি, আর যা যা ভুল বলেছে, রাজা সেইগুলো সুন্দর করে বলে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

রাজা প্রশ্ন করলেন, তারপর কি, বলে যাও ঋষিকুমার।

বালাকি আবার খানিকটা বললে। রাজা তারও দোষ ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দিলেন।

রাজা বললেন, তারপর ?

বালাকি এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। এ রকম লোকের পাল্লায় সে জীবনে পড়ে নি। কিন্তু উপায় নেই। আমতা আমতা করে আবার খানিকটা বললে। রাজা আবার তার দোষ দেখিয়ে কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

বালাকি চুপ।

রাজা বললেন, ঋষিকুমার, শিগগির শিগগির আমাকে তোমার বড় শিষ্য করে নাও। তুমি যে রকম জ্ঞানী লোক,

আমার ভয় হচ্ছে, শেষকালে আর কেউ না তোমার বড় শিষ্য হয়ে যায়।

বালাকির মুখে আর কথাটি নেই।

রাজা বললেন, বল কুমার, আর কি উপদেশ দেবার আছে।

মাথা হেঁট করে বালাকি বসে রইল। একটি কথাও আর তার মুখ থেকে বেরুল না।

ঋষিদের লড়াই

আজকালকার দিনে অনেক বড় বড় সভা সমিতি হয়। তখনও হত। তবে তখনকার দিনে বড় বড় যজ্ঞের বেলায়ই অধিকাংশ সময় এই সব সভা সমিতি হত।

জনক রাজা ছিলেন খুব মস্ত বড় একজন রাজা। রাজা হলে কি হয়, তিনি জ্ঞানীও ছিলেন খুব বড়। একবার তিনি একটা বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। সবাই সেই যজ্ঞের নাম দিয়েছিল বহু-দক্ষিণ। অর্থাৎ তিনি সেই যজ্ঞে অনেক দক্ষিণা দিয়েছিলেন ঋষি আর ব্রাহ্মণদের। বহু দক্ষিণা দেওয়া হয়েছিল বলেই লোকে ঐ নামটি দিয়েছিল।

সেই যজ্ঞে দেশ বিদেশ থেকে অগণিত ঋষি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলেন। আর বিনা নিমন্ত্রণে এসেছিল গরিব দুঃখী দলে দলে হাজারে হাজারে। জনক দু হাতে সকলকে টাকা পয়সা ধন রত্ন খাবার ও কাপড় চোপড় দান করতে লাগলেন। সকলে একবাক্যে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এখন জনক রাজার মনে একটা দুষ্টু বুদ্ধি এল। তিনি চাইতেন দেশে দেশে জ্ঞানের চর্চা হোক, জ্ঞানীর ও গুণীর আদর হোক। তিনি করলেন কি, এক হাজার ভাল ভাল গাই এনে তাদের শিং দুটো সোনার পাতে মুড়ে দিলেন। তারপর সেগুলোকে যজ্ঞ বাড়ির সামনে সার করে বেঁধে রাখলেন।

সেই সময় গরু ছিল একটা বড় সম্পত্তি।

ঋষিরা সব যজ্ঞ বাড়িতে বসে নানা রকম গল্প করছেন। এমন সময় জনক এসে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে যোড়হাতে বললেন, আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। সামনে দেখছেন এক হাজারটি ভাল গাই বাঁধা রয়েছে। আমার সামান্য শক্তিতে যেমন পেরেছি, প্রত্যেকটি গাইএর শিং আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছি। আমার ইচ্ছে আপনাদের মাঝে যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, তাঁকে এগুলো সব দান করি।

ঋষিরা বলে উঠলেন, সাধু সাধু!

জনক বলতে লাগলেন, আপনাদের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ, কে সত্যিকার ব্রহ্মবিদ, আমি জানি নে। আমি করযোড়ে নিবেদন করছি, যিনি ব্রহ্মবিদ, দয়া করে তিনি আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

সোনা বাঁধানো শিং এক হাজার গাইএর ওপর ঋষিদের দৃষ্টি এক সংগে পড়ল। সবাই অবাক। এত বড় দান তো আজ পর্যন্ত কেউ দেয় নি। ঋষিদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু বিপদ হল, কে নেবে এই উপহার?

লোক কখনও নিজেকে গুণী বলে দাবি করেন না। এখন কে এই দান গ্রহণ করবে নিজেকে ব্রহ্মবিদ বলে জাহির করে।

কারুর মুখেই আর কথা নেই। ঋষিরা একে অন্যের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন।

জনক আবার বললেন, আপনারা মনে কোন সংকোচ করবেন না। ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন, দয়া করে তিনি এগিয়ে আসুন, আমার এই সামান্য পুজোটি গ্রহণ করুন।

সবাই চুপ।

তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড হয়ে গেল। যাজ্ঞবল্ক্য উঠে তাঁর এক শিষ্যকে ডেকে বললেন, সামশ্রবা, রাজার এই দান আমি গ্রহণ করছি। গাইগুলো তুমি আশ্রমে নেবার ব্যবস্থা কর।

ঋষিরা সব তখনও চুপ করে বসে।

অন্যান্য শিষ্যদের সহায়তায় সামশ্রবা গরুগুলোর বাঁধন খুলে যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। গরুগুলো যখন ধীরে ধীরে দূরে চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন সবার চমক ভাঙল।

ঋষিদের সভায় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিলে।

ঋষি হলে কি হয়, সবাই তেমন ভাল লোক ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য এ ভাবে সমস্ত গরুগুলো অবাধে নিয়ে গেলেন দেখে কএকজন ঋষির মনে ভয়ানক হিংসে হল। দল বেঁধে তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন।

তাঁরা বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে ব্রহ্মকে জেনেছ, তার

প্রমাণ দিতে হবে। রাজার দান তুমি অমনি নিয়ে যেতে পার না।

যাজ্ঞবল্ক্য ধীর ভাবে জবাব দিলেন, বেশ তো, তাই হোক।

জনক রাজার বড় পুরোহিত ছিলেন অশ্বল। তিনি ভেবেছিলেন, রাজা যেভাবে দানের প্রস্তাব

করলেন, তাতে কোন ঋষিই নিজে যেচে নিজেকে ব্রহ্মবিদ বলবেন না, আর দানও নেবেন না। আর রাজা যখন দানের কথা একবার বলে ফেলেছেন, তখন কোন না কোন ঋষি বা ব্রাহ্মণকে এগুলো তিনি দিয়েই দেবেন। তাহলে বড় পুরোহিত অশ্বল ঠাকুরেরই বরাত খুলবে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এ করলে কি?

অশ্বল রাগে দুঃখে উত্তেজিত হয়ে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললেন, কি হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি সত্য সত্যই ব্রহ্মকে জানতে পেরেছ? তুমি যে গরুগুলো সব নিয়ে গেলে?

অশ্বলের কথায় যাজ্ঞবল্ক্য দুঃখিতও হলেন না, রাগও করলেন না। সহজ ভাবেই বললেন, গাইগুলোর আমার দরকার ছিল ভাই, তাই ওগুলো আমি নিয়ে গেলুম।

জনক রাজা চুপ করে বসে ঋষিদের ব্যাপার দেখতে লাগলেন। হিংসুক ঋষিরা দু তিন জনে দল করে পরামর্শ করতে লাগলেন, কি করে যাজ্ঞবল্ক্যকে জব্দ করা যায়।

অশ্বল কিন্তু থামলেন না। যত কঠিন পারেন, একের পর একটি প্রশ্ন তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে করতে লাগলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ধীর ভাবে সেগুলোর জবাব দিতে লাগলেন। সমস্ত সভা-মণ্ডপ এক গম্ভীর আবহাওয়ায় যেন নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

অনেকক্ষণ প্রশ্ন-যুদ্ধের পর অশ্বল থামতে বাধ্য হলেন। কারণ তাঁর ঘটে কঠিন অস্ত্র বলতে আর কিছুই ছিল না।

ঋষিরা ছিলেন সেকালের সব চাইতে শিক্ষিত আর সভ্য মানুষ। তাঁদের নামগুলো থেকেই আমরা বুঝতে পারি সে যুগে ভারতে কি রকম নাম রাখা হত।

অশ্বল থামলেন তো উঠলেন ঋতভাগ ঋষির ছেলে আর্তভাগ। তিনিও উঠে যাজ্ঞবল্ক্যকে একে একে অনেক প্রশ্ন করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সেগুলোর জবাবও ঠিক ঠিক দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় আর্তভাগের মনে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। তাঁর মনে আর কোন ক্ষোভ রইল না, সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বসে পড়লেন।

লহ্য ঋষির ছেলের নাম ভুজ্যু ঋষি। নামটি তাঁর যেমন অদ্ভুত, স্বভাবটাও ছিল তেমনি। তিনি উঠলেন তখন। আগে মস্ত বড় একটা বক্তৃতা দিয়ে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সংগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তিনি বললেন, সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন ব্রহ্মচারী। বিদ্যা অর্জনের জন্যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেড়াতে বেড়াতে একেবারে মদ্রদেশে গিয়ে হাজির। সেখানে কপিগোত্রের পতঞ্জলের বাড়ি কিছুদিন বাস করেছিলুম। তাঁর মেয়ের ওপর একদিন গন্ধর্বের আবেশ হল। মেয়েটি তখন জ্ঞানহারা। আমরা সবাই তাকে ঘিরে নানারকম প্রশ্ন জিগগেস করতে লাগলুম।

—কে তুমি ?

—আমি গন্ধর্ব। আমার নাম সুধন্বা।

তারপর আমি তাকে শাস্ত্রের অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেছি। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে অনেক জটিল কথা জিগগেস করেছি। সুধন্বা সেগুলোর জবাব দিয়েছিল। সেগুলোই আমি আজ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করছি।

হিংস্রক ঋষিরা বলে উঠলেন, সাধু সাধু !

জনক আর অন্যান্য ঋষিরা চুপ করে দেখতে লাগলেন।

ভুজ্যু প্রশ্ন করতে লাগলেন আর যাজ্ঞবল্ক্য একে একে জবাব দিতে লাগলেন। শেষকালে পরাস্ত হয়ে চুপ করতে বাধ্য হলেন। যতটা অহংকার নিয়ে ভুজ্যু উঠেছিলেন, ঠিক ততটা অপমান ও লজ্জা নিয়ে মাথা হেঁট করে বসে পড়লেন।

তারপর উঠলেন উষস্ত ঋষি।

তারপর উঠলেন কহোল ঋষি।

যাজ্ঞবল্ক্য এঁদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিলেন। এঁরাও শান্ত হয়ে বসে পড়লেন। তারপর উঠলেন একজন নারী-ঋষি। তাঁর নাম গার্গী। হিংসুটে ঋষিরা বলাবলি করতে লাগলেন, এইবার ঠিক হয়েছে। গার্গীর হাতে পরাজিত হলে তবেই যাজ্ঞবল্ক্যের উচিত শাস্তি হয়।

প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণ ছাড়তে লাগলেন গার্গী। আর যাজ্ঞবল্ক্যও স্থির ভাবে তার জবাব দিয়ে চলেছেন একে একে। যাজ্ঞবল্ক্যের কণ্ঠে যেন সরস্বতী বসেছেন।

এই সব প্রশ্ন-উত্তরের একটা নিয়ম ছিল। কোন ঋষি যদি এই নিয়ম ভাঙতেন, তাহলে তাঁর বড় নিন্দে হত। ব্রহ্মের সম্পর্কে কোন অন্যায় কথা যদি কোন ঋষি বলতেন, তাহলে নাকি তাঁর শরীর থেকে মাথাটা খসে পড়ত। ঋষিরা এ রকম বিশ্বাস করতেন।

হঠাৎ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ধমকে উঠলেন, সাবধান বলছি গার্গী, তুমি নিয়ম ভেঙে প্রশ্ন করতে চাইছ, তোমার মাথাটি খসে যাবে।

এ কথায় গার্গী সত্যিই ভয় পেলেন। আর প্রশ্ন জিগগেস না করে তিনি বসে পড়লেন। গার্গী বসে পড়লে একটু সময় সভা শান্ত হয়ে রইল। তার পর উঠলেন উদ্দালক ঋষি।

উদ্দালক বললেন, দুটি প্রশ্ন আমি করছি যাজ্ঞবল্ক্যকে। তিনি যদি সত্যি সত্যি ব্রহ্মকে জেনে থাকেন, তাহলে ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারবেন। যদি না পারেন, তাহলে জানতে হবে তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। তখন প্রমাণিত হবে যে ফাঁকি দিয়ে গরুগুলো তিনি নিয়ে গেছেন। আমি আগে থেকে এই অভিশাপ দিয়ে রাখছি, যদি তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারেন, তা হলে তাঁর মাথাটি খসে যাবে।

যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকের প্রশ্নগুলোর জবাবও দিলেন। উদ্দালকও মুখখানি কালো করে বসে পড়লেন।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের ধমক খেয়ে মনে বড় লজ্জা পেয়েছিলেন। এত সময় চুপ করে বসে থাকলেও মনে মনে আরও কঠিন দুটো প্রশ্ন ঠিক করলেন। উদ্দালক বসে পড়লে তিনি উঠে আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে আহ্বান করলেন।

কঠিন হলেও যাজ্ঞবল্ক্য জবাব দিলেন সুন্দর। গার্গী তখন সকল ঋষিকে সম্বোধন করে বললেন, আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি—যাজ্ঞবল্ক্য যথার্থই ব্রহ্মবিদ। আপনাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যিনি তাঁকে পরাজিত করতে পারেন। আমি তাঁকে নমস্কার করি।

ঋষিরা গার্গীর কথায়ও থামলেন না। তখন উঠলেন বিদগ্ধ ঋষি। কোন জিনিস যদি পুড়ে যায়, সেটাকে বলা হয় দগ্ধ।

বেশ ভাল রকম পোড়া হলে তাকে বলা যায় বিদগ্ধ। বিদগ্ধ ঋষি হিংসার আগুনে পুড়ে যেন একখানি পোড়াকাঠ হয়েছেন। তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। বিদগ্ধ উঠে যাজ্ঞবল্ক্যকে কতকগুলো শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য জবাব দিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য এত সময় অন্যের প্রশ্নের জবাবই দিয়েছেন, নিজে কোন প্রশ্ন করেন নি। অন্যেরা তাঁকে আক্রমণ করেছে, সে আক্রমণ বিফল করে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। শত্রুকে এত সময় তিনি আক্রমণ করেন নি। এবার তিনি পোড়াকাঠ-ঋষিকে বললেন, বিদগ্ধ, তোমার প্রশ্নের জবাব তো আমি দিলুম। এবার আমার পালা। আমার প্রশ্নের জবাব দাও তুমি।

বিদগ্ধ বললেন, আপনার প্রশ্নকে আমি গ্রাহ্য করি নে।

—বেশ, যাজ্ঞবল্ক্য জবাব দিলেন, গ্রাহ্য না করাই ভাল। তবে আমি তোমাকে আগেই বলে রাখি, যদি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে না পার, এখনই সবার সামনে তোমার মাথা খসে যাবে।

পোড়াকাঠ বিদ্রূপ করে উঠলেন, আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমি মেয়েছেলে নই।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্ন করলেন।

বিদগ্ধ কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না, বাধ্য হয়ে চুপ করে রইলেন। দেখতে না দেখতে তাঁর মাথাটি খসে পড়ল শরীর থেকে।

এ ঘটনায় ঋষিদের মাঝে সত্যিই আতংক দেখা দিলে।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমার শ্রদ্ধাভাজন ঋষিরা, আপনাদের মাঝে যাঁর ইচ্ছে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। অথবা সকলেই যদি প্রশ্ন করতে চান, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আর যদি আপনারা অনুমতি করেন, তা হলে আমি আপনাদের মধ্য থেকে যাঁকে ইচ্ছে, অথবা সকলকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।

ঋষিরা সব চুপ। কোন কথা বলবার আর কারুর সাহস হল না।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আপনারা আমার কথার কোনই উত্তর দিচ্ছেন না। যা হোক, আমি আপনাদের মাত্র সাতটি প্রশ্ন জিগগেস করছি, আপনাদের মধ্যে যাঁরা পারেন, এগুলোর জবাব দিন।

জবাব দিতে একজন ঋষিও সাহস করে দাঁড়ালেন না।

এদিকে পোড়াকাঠ ঋষি ঠাকুরের কি হল? সকল ঋষিরই শিষ্য থাকে, তাঁরও অনেক শিষ্য ছিল। মৃতদেহ দাহ করে তাঁর অস্থি নিয়ে শিষ্যেরা গুরুর আশ্রমে ফিরে যাচ্ছিল। পথে ডাকাতরা মনে করলে ওরা রাজার কাছ থেকে বুঝি অনেক ধন রত্ন নিয়ে যাচ্ছে। জোর করে তারা অস্থি-কৌটা বাঁধা পুঁটলিটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। ঋষিকুমার বলেই বোধ হয়, তাদের আর প্রাণে মারলে না।

মৈত্রেয়ী

যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী ছিলেন দুজন—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী ছিলেন গার্গীর মতই খুব জ্ঞানী। গার্গী যেমন ভারতের মহিলাদের মধ্যে খুব নামকরা, মৈত্রেয়ীও ঠিক তাই।

যাজ্ঞবল্ক্য একদিন মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন, মৈত্রেয়ী, শোন তোমার সংগে জরুরী কথা আছে।

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মৈত্রেয়ী এসে স্বামীর কাছে বসলেন, বললেন, কি বলছ ?

—শোন, যাজ্ঞবল্ক্য আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, দেখ আমার বয়স হয়েছে। জান তো শেষ কালে সকলকেই বাড়ি ঘর সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে হয়। সন্ন্যাসী হবার আমারও সময় হয়েছে, তাই ভাবছি—

মৈত্রেয়ী কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না। চুপ করে তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে সময়ে বুড়ো বয়সে প্রত্যেক লোককেই বাড়িঘর স্ত্রীপুত্র সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে হত। সন্ন্যাসী হয়ে তাঁরা বনে চলে যেতেন এবং সেখানে মরবার আগে পর্যন্ত ভগবানের উপাসনা করতেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আমি ভাবছি—

মৈত্রেয়ী বললেন, কি ভাবছ বল না ? থামলে কেন ?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, ভাবছি, আমি তো চলে যাচ্ছি। কাত্যায়নীর সংগে যাতে কোন ভাবে তোমার কোন

কারণ না হয়, সে জন্যে আমাদের বিষয় সম্পত্তি যা আছে, সবই তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাব।

মৈত্রেয়ী বললেন, না না, বিষয় সম্পত্তি কিছুই ভাগ করতে হবে না তোমাকে।

হেসে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তুমিও ভাল মেয়ে, কাত্যায়নীও খুব ভাল মেয়ে। তোমাদের মাঝে বিষয় নিয়ে কখনও কোন বিবাদ হবে না আমি জানি। তবুও ভাগ করে দিয়ে যাওয়াই উচিত হবে মনে করছি।

মৈত্রেয়ী আবার বললেন, না না, তোমাকে ওসব কিছুই করতে হবে না।

—তবে ? যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্ন করলেন।

—তবে আবার কি ? আমি তোমার বিষয় সম্পত্তি কিছুই চাই নে। আমিও সন্ন্যাস নিতে চাই।

যাজ্ঞবল্ক্য আশ্চর্য হলেন না, তবুও চেয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

মৈত্রেয়ী বললেন, তোমার কাছ থেকেই শিখেছি যে সেই

পরম দেবতাকে পাওয়াই সকলের বড়। আর তার জন্যে চেষ্টা করাই সকলের কর্তব্য। আচ্ছা, তুমি যে বিষয়সম্পত্তি আমাকে দিতে চাইছ, তাতে কি আমি সেই পরম দেবতাকে পাব ?

. যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করলেন, না মৈত্রেয়ী, টাকা পয়সা বিষয় সম্পত্তি দিয়ে কেউ কখনও পরম পুরুষকে পায় নি। সংসারে একটু আরামে থাকা যায় মাত্র।

—তবে ? মৈত্রেয়ী বলতে লাগলেন, তবে তুমি আমাকে ঐ সব ধন সম্পত্তি দিতে চাইছ কেন ?

—কারণ স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীরই তো অধিকার। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন।

মৈত্রেয়ী উত্তর করলেন, বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও তোমার আরো সম্পত্তি তো আছে। আমি তোমার কাছে তাই প্রার্থনা করছি। তার অংশ আমাকে দাও।

মৈত্রেয়ীর মনের কথা যাজ্ঞবল্ক্য সবই বুঝতে পারলেন, তবুও চুপ করে রইলেন। মৈত্রেয়ী বললেন, তোমার মত জ্ঞানী আজ এদেশে আর কেউ নেই। তুমি আমাকে জ্ঞান দাও।

এ কথায় যাজ্ঞবল্ক্য বড়ই আনন্দিত হলেন।

অদ্ভুত গাড়োয়ান

গাড়িওলা একজন মস্ত বড় ঋষি ছিলেন। তাঁর গল্প এবার বলছি।

সেই দেশের রাজার ছিল বড় নাম। দেশের ছোট বড় প্রত্যেকেই রাজার প্রশংসা করত শতমুখে। রাজার নামটাও ছিল বেশ কটমট। রাজার নাম ছিল জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ।

জ্ঞানীদের চাইতেও দাতাদের নাম হয় সহজে। রাজা ছিলেন একজন মস্ত বড় দাতা। এই দানের জন্যে দেশে বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন তিনি দান করতেন, খাওয়াতেনও তেমনি। লোককে খাওয়াবার জন্যে তিনি দিকে দিকে অতিথিশালা সব তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেখানে নিত্য হাজার হাজার লোক খাবার পেত।

একদিন গভীর রাত্রে, চারদিক যখন শান্ত নিস্তব্ধ, রাজা তখন তাঁর শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি কথা তাঁর কানে ভেসে এল। চেয়ে দেখলেন আকাশে তুটি হাঁস উড়ে যাচ্ছে। তারা কথা বলছিল। আকাশের দিকে চেয়ে রাজা একমনে শুনলেন—

—ওরে ভাই ভল্লাক, একটু আস্তে আস্তে যা ভাই। আর একটু সাবধানে চল।

—কেন রে?

—জানিস নে? এ দেশের রাজা বড় পুণ্যাত্মা।

—তাতে কি হয়েছে রে?

—তাঁর পুণ্যের তেজ আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সে তেজ যদি তোর গায়ে লাগে, তুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবি।

—যাঃ, বাজে বকিস নি। এই রাজা কি গাড়োয়ান রৈক্কর চাইতেও বড় নাকি?

—রৈক্ক কেরে ভাই?

—দূর বোকা রৈক্কর কথা জানিস নে? গাড়োয়ান রৈক্ক। তাঁর মত জ্ঞানী লোক পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই।

হাঁসেরা উড়ে চলে গেল। তাদের মিলিয়ে যাওয়া আকাশের পানে রাজা অনেক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তার পর ধীরে ধীরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু একটু সময়ও তিনি ঘুমুতে পারলেন না। বার বারই হাঁসের কথা তাঁর মনে হতে লাগল আর কানে যেন শুনতে লাগলেন—রৈক্কর চাইতে জ্ঞানী লোক পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই।

ভোর হতে না হতেই রাজা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং তখনি দূতকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, দূত, এখনই বেরিয়ে যাও। মহাজ্ঞানী রৈক্কর সন্ধান নিয়ে এস।

রৈক্কর খবরে তখনই দূত বেরিয়ে পড়ল। শহরে নগরে সর্বত্র খুঁজে বেড়াল, তবুও কোন সন্ধান বের করতে পারলে না। ফিরে এসে বললে, রাজা, আমি রৈক্কের কোনই সন্ধান পেলুম না।

রাজা প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় খোঁজ করেছ ?

—শহরে বাজারে পথে ঘাটে সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছি।

রাজা বললেন, তুমি ভুল করেছ। রৈক্ক হচ্ছেন একজন জ্ঞানী ঋষি। তিনি নাকি আবার গাড়িওলা। নদীতীরে বনে নির্জন জায়গায় তাঁর সন্ধান কর। এখনই যাও।

আবার দূত চলে গেল।

অনেক খোঁজ করে বহু জায়গা ঘুরে দূত শেষকালে এক গ্রামের শেষে নির্জন বনের ধারে একটি অদ্ভুত লোককে দেখতে পেলে। দূতের কেমন যেন সন্দেহ হল। কাছে গিয়ে দেখে, লোকটি একটা গাড়ির নিচে বসে বসে তার গায়ের খোস চুলকচ্ছে। সারা গায়ে ময়লা। চেহারা দেখেই দূতের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবুও সে জিগগেস করলে, ওগো, তুমি কি রৈক্কর খবর বলতে পারবে, গাড়িওলা রৈক্ক ?

—কেন ?

—কেন আবার। আমাদের রাজা রৈক্কর জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।

—তাই নাকি? আমিই রৈক্ক।

দূত ফিরে গেল।

পরের দিন রাজা স্বয়ং এসে হাজির হলেন রৈক্কর কাছে। বললেন, আমি জানতে পেরেছি আপনি মহাজ্ঞানী। আমাকে আপনি জ্ঞান উপদেশ করুন। আর সামান্য উপহার আপনি গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

ছ শ গাই, একগাছি দামী হার, আর একটি রথ তিনি রৈক্ককে উপহার দিলেন। সে সময় রাজাদের দানের ওপরই ঋষিদের চলত। তাই রাজারা সব সময়ই ঋষিদের দান করতেন। রাজার দান ঋষিরা ইচ্ছে হলে নিতেন, না হলে নিতেন না। রাজাকে তাঁরা বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না।

এই দান দেখে রৈক্কর মন খারাপ হয়ে গেল। বললেন, দূর দূর, এ দান আমি চাই নে। তোমার দান তোমারই থাক।

দুঃখিত হয়ে রাজা ফিরে গেলেন।

পরদিন আবার গিয়ে তিনি ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, ঋষি, আমি আজ আবার এসেছি। আমার প্রতি আপনি দয়া করুন। আজও সামান্য উপহার আমি আপনার জন্যে এনেছি।

সংকুচিত হয়েই রাজা বলতে লাগলেন, এই এক হাজার গাই, এই সোনার হার, এই রথখানি আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা বলতে লাগলেন, এইটি আমার কন্যা। একেও আমি আপনার হাতে আজ দান করছি। আর আপনি যে

গ্রামে বাস করছেন, সে গ্রামখানিও আমি আপনাকে দান করলুম।

রাজার আন্তরিক ব্যবহারে আর দানে রৈক্ক খুশী হলেন। বললেন, আচ্ছা।

সত্যকাম

গৌতম ঋষির আশ্রম।

দলে দলে ছাত্রেরা এখানে ওখানে বসে বেদ পাঠ করছে। মাঝখানে বুড়ো গৌতম ঋষি বসে বড় বড় শিষ্যদের কঠিন কঠিন বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। এমন সময়ে যজ্ঞের কাঠ কাঁধে করে একটি সুন্দর বালক আশ্রমে প্রবেশ করলে।

কাঠগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে বালক গুরু গৌতমকে প্রণাম করলে। গৌতম চেয়ে দেখলেন একটি নতুন ছেলে শিষ্য হবার জন্যে এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তোমার কি নাম ?

—সত্যকাম। বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলে বালক।

গৌতম জিগগেস করলেন, তোমার পরিচয় ?

বালক বললে, পরিচয় ? আমি তো কিছু জানি নে।

গৌতম আবার প্রশ্ন করলেন, তোমার আর কে কে আছেন ?

সত্যকাম জবাব দিলে, আমার মা আছেন, আর কেউ নেই।

গৌতম বললেন, বেশ, তোমার মাকে জিগগেস করে আবার কাল এস।

সত্যকাম চলে গেল। সত্যকামকে বাড়ি ফিরতে দেখে ব্যস্ত হয়ে মা জিগগেস করলেন, কি হল রে, গুরুদেব কি বললেন ?

সত্যকাম বললে, মা, গুরুদেব আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমার কি পরিচয় মা ?

মা বললেন, পরিচয় ? আচ্ছা, কাল যখন গুরুদেবের কাছে যাবি, আমি বলে দেব।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, এই চার বর্ণ ছাড়া আর কোন বর্ণ ছিল না। তারও আগে কোন বর্ণ-বিভাগই ছিল না। শুধু আর্য নামেই সকলকে বোঝাত।

পরে দেখা গেল, ব্রাহ্মণের ছেলে হলে সহজেই তার লেখাপড়া পূজাঅর্চার দিকে মন যায়, ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা শিকার আর লড়াই করতে ভালবাসে, বৈশ্যের ছেলেদের মন কৃষি পশুপালন প্রভৃতি কাজে সহজেই যায়, আর শূদ্রের ছেলেরা এসব কিছুই চায় না, তারা পরের চাকরি পেলেই খুশী। কার পক্ষে কি ভাবের কাজ উপযোগী হবে, ঠিক করবার জন্যেই গুরুরা সকলের আগে শিষ্যের পরিচয় জেনে নিতেন।

তখনকার দিনের আর একটি নিয়ম ছিল, ছেলেরা যখন গুরুর কাছে পড়তে যেত, তখন গুরুর আশ্রমেই থাকত। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফিরত না।

সত্যকামের মার নাম জবালা। সারারাত তিনি ভেবেছেন। তাঁর প্রাণের ইচ্ছে তাঁর আদরের ধন সত্যকাম বেদপাঠ শিখে সত্যিকার মানুষ হোক, সমাজের মাঝে নামকরা একজন হোক। কিন্তু তাঁদের যে কোন গৌরবের পরিচয় নেই। গৌতম ঋষি কি তাঁর ছেলেকে শিষ্য করবেন?

পরদিন ভোর বেলা সত্যকাম এসে মাকে বললে, মা, আমি যাব এবার গুরুদেবের কাছে। তুমি আমার পরিচয় বলে দাও।

জবালা বললেন, বাবা, আমাদের কোন গৌরবের পরিচয় নেই। বহু লোকের ঘরে দাসীগিরি করে আমি তোমাকে মানুষ করেছি। গুরুদেবকে একথা বলো।

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সত্যকাম চলে গেল। যত সময় তাকে দেখা গেল, মা দাঁড়িয়ে থেকে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর দুটি চোখ তাঁর জলে ভরে উঠল। হাত জোড় করে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করলেন, দেবতা, আমার সত্যকামকে তুমি দেখো, তার মংগল করো।

গৌতম জিগগেস করলেন, কি বাবা, মাকে জিগগেস করেছিলে ?

প্রণাম করে সত্যকাম বললে, হ্যাঁ, গুরুদেব, তিনি বললেন, কোন গৌরবের পরিচয় আমাদের নেই। অনেক লোকের ঘরে দাসীগিরি করে তিনি আমাকে মানুষ করেছেন।

শিষ্যেরা সব হাঁ করে চেয়ে রইল সত্যকামের দিকে। মা দাসীগিরি করেছেন, এসব লজ্জার কথা নিজের মুখে কেউ কি কখনও বলে ?

বৃদ্ধ গৌতমের চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সত্যকামের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, নিজের সম্বন্ধে এ রকম স্পষ্ট সত্য কথা যে বলতে পারে, সেই তো ব্রাহ্মণ। তোমার আর অন্য পরিচয়ের দরকার নেই সত্যকাম। তোমাকে আমি গ্রহণ করলুম।

সে সময়ে গুরুদেবের আশ্রমের সমস্ত কাজকর্ম শিষ্যদেরই করতে হত। আর আশ্রমের কাজকর্মও বড় কম ছিল না। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলত। আশ্রমে থাকত শত শত গরু। লোকজনও তো বড় কম থাকত না এক একটা আশ্রমে। তাদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন, সেও তো বড় ছোট কাজ নয়।

যারা নতুন আসত, তাদের বুদ্ধি, মনের জোর আর কাজের শক্তি কি-রকম আছে, পরীক্ষা করবার জন্যে গুরুরা অনেক সময় তাদের কঠিন কঠিন কাজ দিতেন।

সত্যকামকে ডেকে গৌতম বললেন, যত্ন ও খাবার অভাবে আমার ৬০০ গরু রোগা হয়ে গেছে। তুমি এগুলো নিয়ে বনে

চলে যাও। গরুগুলোর যত্ন করো। যখন এগুলো বেশ মোটা সোটা হবে, আর সংখ্যায় বাড়বে তখন নিয়ে এস।

সত্যকাম বললে, এদের সংখ্যা যখন এক হাজার করতে পারব, সেদিন আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন। গরু নিয়ে গৌতম চলে গেল।

সত্যকাম গিয়েছিল গৌতম ঋষির কাছে বেদ শিখতে। কিন্তু তাকে হতে হল রাখাল। বনে বনে সে গরু চরিয়ে বেড়াতে লাগল। তাও আবার ছু চারটি নয়, একেবারে ছ সাত শ। তার নিজের খাবার কিছু নেই। গরুগুলো পাহারা দেবার ফাঁকে ফাঁকে বন থেকে ফল মূল কুড়িয়ে তাই খেতে হয়। রাত্রিবেলা গরুগুলোকে একত্র করে পাহারা দিতে হয়। বাঘ নেকড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

সত্যকামের মনে কিন্তু এতটুকু ছুঃখ নেই। গুরুদেবের আশ্রমের গরু। গুরুদেবের সেবা করতে হলে সে যেমন তার সমস্ত মন দিয়ে করত, গরুর বেলাও ঠিক সেরকম যত্ন নিতে লাগল।

এভাবে দিন কাটতে লাগল। ধীরে ধীরে গরুগুলো বেশ মোটা সোটা হয়ে উঠল এবং তাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। সত্যকাম তার মায়ের কথা ভুলে গেছে, তার নিজের শরীরের কথা ভুলে গেছে। একমনে সে গরুগুলোর সেবাই শুধু করে চলেছে।

একদিন সত্যকাম শুনতে পেলে একটা ষাঁড় যেন তাকে

বলছে, সত্যকাম, আমাদের সংখ্যা এক হাজার হয়ে গেছে। এবার আশ্রমে ফিরে চল।

সত্যকাম গুণে দেখলে সত্যি তাই। সব গরু একত্র করে ধীরে ধীরে আশ্রমের পথে যাত্রা করলে। যেতে যেতে সে শুনতে পেলে গরু যেন তাকে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, কত জ্ঞানের কথা বলছে।

যেতে যেতে পথে সন্ধ্যা নেমে এল। গরুগুলো এক জায়গায় বেঁধে রেখে সত্যকাম শুকনো কাঠ যোগাড় করে আনলে। তাতে আগুন দিয়ে সে অত্যন্ত সাবধানে পাহারা দিতে লাগল।

গভীর রাত, অন্ধকারের গাঢ় আবরণে গা ঢাকা দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুমুচ্ছে, শুধু আগুন জেগে আর সত্যকাম জেগে। সত্যকাম যেন শুনতে পেলে আগুন বলছে সত্যকামকে কত জ্ঞানের কথা।

সত্যকাম মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে গরুগুলো সংগে নিয়ে সত্যকাম আবার যাত্রা করলে এবং দিনশেষে এক বনের ধারে আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাবার আয়োজন করলে।

গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। অন্ধকার বনানীর ধারে আগুনের শিখা সুন্দর দেখাচ্ছে। সত্যকাম বসে বসে হয়তো তার গুরুদেবের কথাই ভাবছে। এমন সময় একটি পাখি উড়ে এসে সত্যকামের খুব কাছেই একটা গাছের ডালে বসল।

সত্যকাম দেখলে একটা হাঁস এসে বসেছে। একদৃষ্টে

সেই হাঁসের দিকে চেয়ে রইল। হাঁসও যেন তাকে অনেক নতুন নতুন কথা বলতে লাগল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আবার সত্যকাম গরুগুলো বেঁধে রেখে রাত কাটাবার জন্যে আগুন জ্বাললে, তখন আর একটি পাখি উড়ে এসে তার কাছেই একটা গাছের ডালে বসল।

অন্যের কাছ থেকে দুটো জ্ঞানের কথা শুনলেই কিন্তু মানুষের জ্ঞান হয় না। জ্ঞান পেতে গেলে আগে মন তৈরী হওয়া চাই।

মনের মধ্যে যদি কবিত্ব থাকে, তাহলে আকাশ বাতাস ফুল পাখি সবই কথা বলতে পারে কবির কানে। অন্য লোক তা শুনতে পায় না, পায় শুধু কবি। তাই সে কবিতায় লিখে যায় সাধারণ মানুষের জন্যে। মানুষের অন্তর যখন পরিষ্কার হয়, জ্ঞানের উপযোগী হয়, তখন সে সারা পৃথিবী থেকেই জ্ঞানের শিক্ষা পায়।

সত্যকামেরও তাই হয়েছিল। তাই সে সকলের কাছ থেকেই জ্ঞান পেয়েছিল। পাখিটা তার কাছে সেদিনও অনেক কথা বলে গেল।

পরদিন সত্যকাম তার গুরুর আশ্রমে পৌঁছে গেল। দীর্ঘকাল পরে সত্যকামকে দেখতে পেয়ে গৌতমের ভারী আনন্দ হল। বললেন, এস বাবা সত্যকাম এস।

গুরুকে প্রণাম করে সে বললে, গুরুদেব গরুর সংখ্যা এক হাজার পূর্ণ হয়েছে, আর তারা বেশ সতেজ ও মোটাসোটাও হয়েছে।

গৌতম হেসে বললেন, বেশ বেশ। কিন্তু সত্যকাম,

তোমার মুখখানি তো জ্ঞানীর মুখের মতই মনে হচ্ছে। তোমাকে কে উপদেশ দিয়েছে বল।

সত্যকাম উত্তর করলে, আমাদের একটা ষাঁড়, আগুন, হাঁস আর একটা বুনো পাখির কাছ থেকে আমি উপদেশ পেয়েছি।

কি কি জ্ঞান পেয়েছে সত্যকাম একে একে সবই বললে। তারপর বললে, গুরুদেব, আমার এই সব জ্ঞান কি সত্যিই ঠিক হয়েছে?

—হয়েছে। প্রসন্ন মনে গৌতম জবাব দিলেন।

—গুরুদেব, শুনেছি গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা না হলে সে জ্ঞান পূর্ণ হয় না। আমি যাতে পূর্ণ জ্ঞান পাই আপনি তাই বলুন।

সন্তুষ্ট হয়ে গৌতম সত্যকামকে নিজের সব বিদ্যে নিঃশেষ করে উপদেশ দিলেন।

উপকোশল

সত্যকামের পাঠ শেষ হয়েছে। গৌতমের কাছ থেকে বাড়ি ফিরে তিনি বিয়ে করলেন এবং সংসার করতে লাগলেন। অল্পদিনের মাঝেই তাঁর নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। বহু ছাত্রও আসতে লাগল তাঁর কাছে বিদ্যা পাবার জন্যে।

বারো বছরের একটি ছেলে, নাম তার উপকোশল, সেও সত্যকামের কাছে এসে তাঁর শিষ্য হল। ঋষিদের আশ্রমে সারা দিন সারা রাতই তো যজ্ঞের আগুন জ্বলত। সে আগুন

কখনও নিভত না। সে সব দিনে দেশলাই তো ছিলই না, এমন কি চকমকি পাথরও ছিল না। তখন কাঠে কাঠে ঘসে আগুন বের করা হত। সে ছিল বড় হ্যাংগামের কাজ।

ধর, রাত্রি বেলা গোয়াল ঘরে বাঘ পড়ল অথবা রাক্ষসরাই এসে আশ্রম আক্রমণ করলে। তখন ঘরে যদি আগুন জ্বালানো না থাকে তাহলে ঘুম থেকে উঠে কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালতে জ্বালতেই ওদিকে সব শেষ হয়ে যাবে। যজ্ঞের কথা ছেড়ে দিয়ে এই সব কারণেও আশ্রমে সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখা দরকার হত।

এই আগুনের যত্ন নেওয়াও একটা মস্ত বড় কাজ ছিল। ঋষিরা তাঁদের কোন কোন শিষ্যের ওপর এই আগুন দেখাশোনা ও রক্ষার ভার দিতেন।

সত্যকাম উপকোশলকে এই আগুন দেখবার ভারটি দিলেন। উপকোশলও যত্ন করে সে কাজ করতে লাগল। এভাবে দিনের পর দিন কেটে গেল, বছরের পর বছরও কেটে গেল।

সাধারণত নিয়ম ছিল শিষ্যেরা বারো বছর বয়সে গুরুর আশ্রমে যেত এবং সেখানে আরো বার বছর থেকে বেদ শিখত।

তারপর গুরু আদেশ করলে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়ে করে সংসার করত।

উপকোশল দেখলে কারুর বারো বছর শেষ হলেই সত্যকাম তাকে বলছেন, তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমার বেদপাঠ শেষ হয়েছে। তুমি এবার সংসার-ধর্ম পালন কর গে।

উপকোশলেরও বারো বছর শেষ হল। কিন্তু গুরু তাকে কিছুই বললেন না।

সত্যকামের স্ত্রী একদিন বললেন, ওগো, এক সংগে যারা এসেছিল, সবাই পাঠ শেষ করে বাড়ি ফিরে গেল। উপকোশলকে তুমি এখনও বাড়ি পাঠালে না। বেচারা বারোটি বছর তোমার জন্যে কাঠ কেটেছে, তোমার আগুনের দেখাশোনা করেছে কত কষ্ট করে। ওকে যা যা শেখাবার শিখিয়ে দিয়ে তার পাঠ শেষ করে দাও না ?

সত্যকাম কোনই জবাব দিলেন না। উপকোশলকেও কিছু বললেন না। উপকোশলকে কোন উপদেশ দেওয়া তো দূরের কথা, তিনি আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন প্রবাসে।

উপকোশল এতে বড় দুঃখ পেলে। সেদিন থেকে সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলে। সত্যকামের স্ত্রী বললেন, উপকোশল, বাবা, উপোস করছ কেন ? খাও।

উপকোশল জবাব দিলে, না মা, আমি বুঝতে পেরেছি। মন আমার পরিষ্কার নয়। আমি এখনও জ্ঞান পাবার উপযুক্ত হই নি। তাই গুরু আমাকে কোন উপদেশ দিলেন না, প্রবাসে চলে গেলেন।

না খেয়ে না দেয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাবে মনকে পরীক্ষা করে উপকোশল তপস্যা করতে আরম্ভ করলে। সত্যকাম যেমন তাঁর ছাত্রবয়সে ষাঁড়, আগুন, হাঁস ও পাখির কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন, উপকোশলও তেমনি একদিন আগুনের কাছ থেকে জ্ঞান পেলে। বারোটি বছর সে আগুনের যত্ন নিয়েছে, তাই আগুনের কাছ থেকেই তার প্রথম জ্ঞান লাভ হল।

সত্যকাম বাড়ি ফিরে ডাকলেন, উপকোশল।

উপকোশল এসে গুরুকে প্রণাম করলে। সত্যকাম বললেন, জ্ঞান পাবার পর মানুষের মুখখানি যেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়, তোমার মুখখানিও আজ সে রকম দেখাচ্ছে। তুমি কার কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছ ?

আগুনের কাছ থেকে যেমন যেমন জ্ঞান সে পেয়েছে, সমস্ত উপকোশল বললে। আর বললে, আমার মনে হচ্ছে, আপনার উপদেশ না পেলে আমার শিক্ষা শেষ হবে না। আপনি আমাকে দয়া করে উপদেশ করুন।

গুরু খুশী হয়ে বললেন, উপকোশল, তোমার পাঠ শেষ হয়েছে।

জ্ঞানের পিপাসা

গৌতম নামটা সে সময়ে বেশ প্রচলিত ছিল। অনেক ঋষির নামই গৌতম ছিল। আর তাঁরা সকলেই বেশ নামকরা ছিলেন।

আমি যে গৌতম ঋষির কথা বলছি, শ্বেতকেতু নামে ছিল তাঁর একটি ছেলে। বাবার কাছে সে বেদ পড়া শেষ করে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল। তার মনে হয়তো একটু অভিমানও হয়েছিল এই ভেবে যে একজন মস্ত বিখ্যাত ঋষির ছেলে সে, তার ওপর সে বেদপাঠ ভাল করেই শেষ করেছে।

বেড়াতে বেড়াতে একদিন শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-রাজের সভায় গিয়ে উপস্থিত। পাঞ্চাল-রাজও ছিলেন খুব জ্ঞানী লোক। ঋষিকুমারকে দেখে তিনি খুব আদর করলেন।

শ্বেতকেতু বললে, আমার নাম শ্বেতকেতু, বিখ্যাত জ্ঞানী গৌতম ঋষি আমার বাবা।

রাজা বললেন, শুনে ভারী সুখী হলুম। আচ্ছা শ্বেতকেতু, তোমার বাবা তোমাকে কি বিদ্যা শিখিয়েছেন?

—সব বিদ্যাই শিক্ষা দিয়েছেন।

—বেশ, আচ্ছা বল দেখি মরবার পর মানুষ কোথায় যায়?

শ্বেতকেতু বললে, আমি জানি নে।

রাজা আবার প্রশ্ন করলেন, মানুষ কোত্থেকে এসে এই পৃথিবীতে জন্ম নেয়?

—সে কথাও আমি জানি নে।

এ রকম আরও তিনটি প্রশ্ন রাজা করলেন। শ্বেতকেতু প্রত্যেক প্রশ্নেই এক জবাব দিলে—আমি জানি নে।

রাজা বললেন, সে কি কথা? তাহলে তুমি কি জ্ঞান পেয়েছ? তোমার বাবাই বা তোমাকে কি শিক্ষা দিয়েছেন?

এ কথায় শ্বেতকেতুর মনে বড় দুঃখ ও লজ্জা হল। মনের দুঃখে সে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর আর কোন দিকে পা না বাড়িয়ে সোজা বাড়িতে তার বাবার কাছে এসে বললে, বাবা, তুমি আমাকে কি শিখিয়েছ? পাঞ্চাল রাজসভায় গিয়ে কি লজ্জাটাই না আমি পেয়েছি। রাজা আমাকে একে একে পাঁচটি প্রশ্ন করলেন। একটারও জবাব দিতে পারলুম না।

গৌতম বললেন, কি প্রশ্ন করেছেন শুনি।

শ্বেতকেতু একে একে সব বললে।

গৌতম বললেন, এগুলোর জবাব তো আমিও জানি নে। জানলে তোমাকে নিশ্চয়ই শিখিয়ে দিতুম।

বালক ও যুবা বয়সেই তো মানুষ পড়াশোনা করে। বুড়ো বয়সটা শিক্ষা নেবার পক্ষে ঠিক উপযোগী নয়। কিন্তু এক একজন বুড়ো মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, জ্ঞানের পিপাসা যাঁর অন্তরে কোন বালক বা যুবকের চাইতে কম নয়।

গৌতমও ছিলেন সেই রকমেরই বুড়ো। ছেলের মুখ থেকে পাঞ্চালরাজের কথা শোনবার পর রাতদিনই তাঁর মনে হতে লাগল—পাঞ্চাল যেতে হবে, গিয়ে রাজার কাছ থেকে ঐ জ্ঞানটুকু শিখে আসতে হবে।

আশ্রমের ভার অন্যদের ওপর দিয়ে শেষকালে পাঞ্চালের পথে সত্যি সত্যিই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। রাজবাড়ি উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে খুব সমাদর ও সম্মান করলেন। রাজা বললেন, ঋষি, ধন সম্পত্তি আপনার যা প্রয়োজন আমাকে বলুন। আমি তা আপনাকে উপহার দেব।

উত্তরে গৌতম বললেন, রাজা, ধন সম্পত্তির জন্যে আমি আপনার কাছে আসি নি। আপনি আমার ছেলেকে যে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি তো সেগুলো জানি নে। আমার গুরুও তো আমাকে এগুলো শেখান নি। সেই জ্ঞান পাবার আশা ও প্রার্থনা নিয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি।

বুড়ো গৌতম ঋষির জ্ঞানের পিপাসা দেখে রাজা খুশী হলেন। রাজা বললেন, ঋষি, এ জ্ঞান পেতে হলে অনেক কাল আমার কাছে থেকে তপস্যা করতে হবে যে।

গৌতম বললেন, আমি তাই করব।

তুমিই সেই

উদ্দালকের গল্প বলেছি, শ্বেতকেতুর গল্পও বলেছি। অন্য এক উদ্দালক আর তাঁর ছেলে শ্বেতকেতুর গল্প এবার বলছি।

শ্বেতকেতুর লেখাপড়া শেখার বয়স হল, কিন্তু সেদিকে তার মন নেই। উদ্দালক একদিন শ্বেতকেতুকে ডেকে বললেন, শ্বেতকেতু, তোমার বেদ পড়বার বয়স হয়েছে। অথচ তোমার সেদিকে মন নেই কেন? ঋষির ছেলে হয়ে যদি বেদ না জানে, তাহলে যে বড় নিন্দের হয়, তুমি কি তা জান না?

বাবার কথায় লজ্জা পেয়ে শ্বেতকেতু অন্যত্র গুরুর কাছে চলে গেল পড়তে। তখন তার বয়স বারো। আরও বারো বছর সে গুরুর আশ্রমে থেকে বেদ শিখলে।

বেদ শিখেছিল সে ভালই। এজন্যে তার মনে বেশ একটু অহংকারও ছিল। চব্বিশ বছর বয়সে সে যখন বাড়ি ফিরল, তখন তার বাবা তার অহংকারের ভাব দেখে বড় দুঃখিত হলেন। কারণ সত্যিকারের জ্ঞানী লোক কখনও অহংকারী হন না। অহংকারী লোক যদি জ্ঞানের কথা জানেও, সে জ্ঞান তার কোন কাজে আসে না।

শ্বেতকেতুকে ডেকে তিনি বললেন, শ্বেতকেতু তুমি তো অনেক বিদ্যা শিখে এসেছ। ঋকবেদ যজুর্বেদ সামবেদ সবই তুমি শিখেছ। কিন্তু তুমি এমন উদ্ধত ও অহংকারী হয়েছ কেন?

শ্বেতকেতু চুপ করে রইল, কোন জবাব দিলে না।

উদ্দালক আবার বললেন, আচ্ছা, কতটা জ্ঞান তোমার হয়েছে দেখি। বল, কখনও শোনা যায় নি, কখনও ভাবা যায় নি, কখনও জানা যায় নি, এমন বিষয়ও যার দ্বারা জানা যায়, এমন কোন জিনিসের কথা কি তুমি শুনেছ?

এ রকম কোন কথা শ্বেতকেতু শোনে নি। সে জবাব দিলে, বাবা, আমার গুরু নিশ্চয়ই এটি জানতেন না, তাই আমাকেও শেখান নি।

উদ্দালক চুপ করে রইলেন, শ্বেতকেতুর কথার আর কোন জবাব দিলেন না।

শ্বেতকেতু বললে, বাবা, তুমিই আমাকে উপদেশ কর।

উদ্দালক বলতে আরম্ভ করলেন। সেই সব কথা শুনে শ্বেতকেতুর মনের অহংকার চিরদিনের মত দূর হয়ে গেল। সরল ছাত্রের মত বাবার পায়ের কাছে বসে সে উপদেশ শুনতে লাগল।

মনের কথা বলতে গিয়ে উদ্দালক যা বললেন, শ্বেতকেতু তার কিছুই বুঝতে পারলে না। তখন বাবা বললেন, শ্বেতকেতু কাল থেকে তুমি উপোস কর। অন্য কোন খাবার খেও না। পিপাসা হলে শুধু জল খেও।

শ্বেতকেতু তাই করলে। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, শ্বেতকেতু শুধু জল ছাড়া আর কিছু খায় না। পনের দিন উপোসের পর শ্বেতকেতুর শরীর একেবারে দুর্বল আর রোগা হয়ে গেল। পনের দিন উপোস করবার কথা ছিল।

ষোল দিনের দিন সকালে অতি কষ্টে সে তার বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বললে, বাবা, আমি উপোস করেছি। এবার আমাকে উপদেশ দাও।

বাবা বললেন, এবার ঋকবেদ যজুর্বেদ সামবেদ যা তোমার ইচ্ছে হয় বল দেখি। তোমার তো সবই মুখস্থ আছে।

শ্বেতকেতু চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুই তার মনে এল না। আশ্চর্য হয়ে বাবাকে সে বললে, বাবা সবই তো আমার মুখস্থ ছিল, কিন্তু এখন যে কিছুই মনে আসছে না।

উদ্দালক বললেন, তবে যাও তোমার মার কাছে। বেশ পেট ভরে খেয়ে এস।

শ্বেতকেতু তাই করলে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, একটু সময় পরেই আবার তার মন বেশ সতেজ হয়ে উঠল। তখন সবই আবার সে মনে করতে পারলে।

উদ্দালক বললেন, শ্বেতকেতু, যার শরীর দুর্বল, যার মন দুর্বল, সে কখনও জ্ঞান পায় না। পেলেও তার কাজে আসে না।

উঁচু জায়গায় জল জমে না। মানুষ যত সময় অহংকারে মাথা উঁচু করে চলে, তত সময় তার সত্যিকার জ্ঞান হয় না। শ্বেতকেতুর মনের অহংকার একেবারেই মিলিয়ে গেল। তাই যথার্থ জ্ঞান পাবার উপযোগী হল সে।

উদ্দালক বললেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু দেখছ সবই এসেছে সেই ব্রহ্ম থেকে।

শ্বেতকেতু বললে, কই ব্রহ্মকে তো দেখা যায় না।

—দেখা না গেলেও তাই থেকেই সব হয়েছে। উদ্দালক বললেন।

.সামনেই একটা মস্ত বড় বটগাছ ছিল আর তাতে অনেক গুলো পাকা পাকা ফলও দেখা যাচ্ছিল। উদ্দালক বললেন, যাও, একটা ফল গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এস।

শ্বেতকেতু তাই করলে।

—এটি ভাঙ দেখি।

ফলটি ভাঙা হল।

—কি দেখছ ভেতরে।

—ছোট ছোট বীজ। শ্বেতকেতু জবাব দিলে।

—আচ্ছা, একটা বীজ ভেঙে ফেল দেখি।

শ্বেতকেতু বীজ ভেঙে ফেললে।

উদ্দালক বললেন, ভেতরে কি দেখছ?

—কিছুই না তো।

উদ্দালক বললেন, এই ছোট বীজটুকুর ভেতরে খুব ছোট আরও অংশ আছে। তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না।

কিন্তু সেই অংশের মাঝেই একটা মস্ত বড় বটগাছ লুকিয়ে রয়েছে।

অবাক হয়ে শ্বেতকেতু বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

উদ্দালক বলতে লাগলেন, এই ছোট্ট বীজটি মাটিতে পুঁতলে একটা চারাগাছ বেরুবে। তাই থেকে ধীরে ধীরে মস্ত বড় একটা বটগাছ হবে তো ?

শ্বেতকেতু বললে, হ্যাঁ।

—কাজেই ঐ ছোট্ট বীজটির মাঝেই এত বড় একটা বিরাট গাছ জন্মাবার শক্তিটুকু লুকিয়ে আছে।

উদ্দালক বললেন, এই বিশ্বজগৎ ব্রহ্ম থেকেই রূপ নিয়েছে। আবার বিশ্বের যা কিছু সবার মাঝেই ব্রহ্ম রয়েছেন।

শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করলে, কই বাবা, আমরা তো তা দেখতে পাই নে।

উদ্দালক বললেন, বেশ, এক গামলা জল নিয়ে এস।

শ্বেতকেতু জল আনলে।

—এবার এক চাকা লবণ এনে এর মাঝে ছেড়ে দাও। তারপর আজ যাও, কাল সকালে আবার আমার কাছে এস।

পরদিন সকালে আবার শ্বেতকেতু তার বাবার কাছে গিয়ে বসল। উদ্দালক বললেন, কাল এই জলের মাঝে তুমি লবণের চাকাটি রেখেছ। চাকাটি তুলে এনে আমাকে দাও।

শ্বেতকেতু চেয়ে দেখলে জলের কোথাও লবণের চাকাটি

দেখা যাচ্ছে না। বললে, কই, লবণের চাকাটি দেখতে পাচ্ছিং না তো।

উদ্দালক বললেন, তাই তো। তাহলে লবণ গেল কোথায়? আচ্ছা, এক কাজ কর। ওপর থেকে একটু জল নিয়ে মুখে দাও দেখি।

শ্বেতকেতু তাই করলে, বললে, বাবা, লবণ, জলের মাঝে লবণ।

—আচ্ছা, মাঝখান থেকে একটু জল নিয়ে মুখে দাও। তারপর একেবারে তলা থেকেও একটু জল তুলে মুখে দাও।

তাই করে শ্বেতকেতু বললে, সব জায়গায়ই লবণ।

উদ্দালক বললেন, অথচ বাইরে থেকে তুমি লবণ দেখতে পাচ্ছ না। এই রকম করেই ব্রহ্ম সারা জগতের মাঝে মিশে ও মিলিয়ে আছেন, আর শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম।

ইন্দ্র-বিরোচন

দেবতা আর অসুরদের বিবাদ চিরকালের। বিবাদটা যখন বেশ জমে ওঠে, তখনই লেগে যায় লড়াই। যখন লড়াই হয় না, তখন প্রত্যেকেই ভাবতে থাকে কি করে শত্রুকে একেবারে শেষ করে ফেলা যায়। কিন্তু কেউই আর একেবারে শেষ হয় না।

প্রজাপতি ছিলেন ঋষিদের সকলের চাইতেই বড়। প্রজাপতি বললেন, আত্মার রোগ নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই। যে এই আত্মাকে জানে, তার সব কামনাই পূর্ণ হয়।

এই কথাটা কি রকম করে দেবতাদের কারুর কারুর কানে গেল। তাঁরা শুনে তো মহাখুশী। বললেন, চুপ, চুপ! কথাটা আবার অসুররা না শুনতে পায়।

আর দেরি না করে দেবতাদের মাঝে যাঁরা বড় বড়, তাঁরা এক পরামর্শ সভা করলেন খুব গোপনে। সে সভায় ঠিক হল একজনকে প্রজাপতির কাছে যেতে হবে। কোন রকম করে বুড়োর কাছ থেকে ঐ বিদ্যেটা জেনে আসতে পারলে আর পায় কে! দেবতারা একে একে সকলে শিখে নেবেন। তাহলে তাঁদের সব কামনাই তো পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন অসুর গুলোকে শেষ করতে আর কত সময় লাগবে!

কিন্তু ভাবনা হল, কে যাবে প্রজাপতির কাছে।

অনেক ভাবনা চিন্তা অনেক পরামর্শ করে শেষ কালে ঠিক হল, দেবতাদের রাজা ইন্দ্রেরই যাওয়া উচিত। কারণ তাঁর শক্তি বেশী এবং সহজেই তিনি শিখে আসতে পারবেন।

পরদিন ভোরেই ইন্দ্র যাত্রা করলেন প্রজাপতির আশ্রমের দিকে।

এ দিকে হয়েছে কি! অসুরদের কানেও প্রজাপতির কথাটা কি করে চলে গেছে। তারা ভাবলে দেবতারা বুঝি তখনও খবর পান নি। তাড়াতাড়ি তারা পরামর্শ করে তাদের রাজা বিরোচনকে পাঠিয়ে দিলে প্রজাপতির কাছে।

ইন্দ্রও বিরোচনের কথা জানেন না, আবার বিরোচনও ইন্দ্রের কথা জানেন না। দু জনে দুদিক থেকে আসছেন। ঠিক প্রজাপতির আশ্রমের কাছাকাছি এসে দুজনেই একেবারে

মুখোমুখি। এঁর হাতেও যজ্ঞের কাঠ, ওঁর হাতেও যজ্ঞের কাঠ।

ভেতরে যাই থাক, বাইরে কিন্তু এক গাল হেসে ইন্দ্র জিগগেস করলেন, কি ভাই বিরোচন, এদিকে কি মনে করে?

—এই অমনি একটু বেড়াতে এলুম। তুমি? হেসে বিরোচন জবাব দিলে।

—আমিও এদিকে একটু বেড়াতে এলুম।

বলতে বলতে তাঁরা প্রজাপতির আশ্রমে গিয়ে হাজির। প্রজাপতি দেখে সবই বুঝতে পারলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না।

যজ্ঞ-কাঠ এক পাশে রেখে দুজনেই গিয়ে প্রজাপতিকে প্রণাম করলেন। প্রজাপতি তবুও কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন কি করবেন? শিষ্যদের সংগে মিশে আশ্রমের কাজকর্ম করেন, খান দান আর বসে বসে প্রজাপতির পড়ানো দেখেন।

এভাবে দিনের পর দিন কেটে গেল, মাসের পর মাস কাটল, এমন কি বছরের পর বছরও কাটতে লাগল। প্রজাপতিও কিছু বলেন না, ইন্দ্র বিরোচনও আশ্রম ছেড়ে যান না।

ইন্দ্রের মনে সন্দেহ হল—তাহলে বিরোচনটাও প্রজাপতির ঐ কথাটি শুনতে পেয়েছে নাকি?

বিরোচনও ইন্দ্রের ওপর ঠিক এ রকম সন্দেহ করলেন। অথচ কেউ কাউকে মুখ ফুটে জিগগেস করতে সাহস করলেন না। একদিন ইন্দ্র ভাবলেন, আচ্ছা, বিরোচনকে একটু পরীক্ষা

করেই দেখা যাক। বললেন, কি ভাই বিরোচন, এখানে কিছু কাল থাকবে নাকি?

—কিছুকাল? না, সে রকম কিছু নয়। এই যখন এসেছি প্রজাপতির আশ্রমে, দু চার দিন থেকে দুটো ভাল কথা শুনে যাই। তুমি কতদিন থাকবে এখানে? বিরোচন জিগগেস করলেন।

—না, কত দিন আর থাকব! ইন্দ্র বললেন, আমারও তোমারই মত দুটো ভাল কথা শুনে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা বিরোচন, তুমি কি প্রজাপতির কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও নাকি? অথবা কিছু শিক্ষা টিক্ষা—

ইন্দ্রের প্রশ্নে বিরোচন একেবারে চমকে উঠলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না ভাই, সে রকম কিছু নয়। তুমি কিছু চাও নাকি, শিখতে বা জানতে টানতে—

—না ভাই, সে রকম কিছু নয়। ইন্দ্র বললেন।

এ রকম করে দিন কাটতে লাগল। অনেক বছর পর হঠাৎ একদিন প্রজাপতি তাঁদের দুজনকে এক সংগে ডেকে পাঠালেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা আমার কাছে এসে দীর্ঘকাল তপস্যা করছ। তোমাদের কি ইচ্ছা বল।

ইন্দ্র আর বিরোচন দুজনেই দুজনের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। কিন্তু না বলেও তো উপায় নেই। দুজনেই বললেন, আপনি নাকি বলেছেন, আত্মার রোগ নেই, দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। যে আত্মাকে জানবে তার সকল কামনাই পূর্ণ হবে। আমরা আত্মাকে জানতে চাই। আপনি উপদেশ করুন।

প্রজাপতি বললেন, বেশ, ভাল কথা। শোন, আমাদের চোখের মাঝে যাঁকে দেখা যায়, তিনিই আত্মা। তাঁর মৃত্যু নেই, তাঁর ভয় নেই, তিনিই ব্রহ্ম।

বিরোচন জিগগেস করলেন, আচ্ছা, জলে যে পুরুষকে—

ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন, দর্পণে যে পুরুষকে দেখা যায়, উনি কে?

প্রজাপতি উত্তর করলেন, জলের মাঝে আর আয়নায় সেই আত্মাকেই দেখা যায়।

প্রজাপতি আরও বললেন, তোমরা যাও, জলের মাঝে নিজেদের দেখ, তারপর আত্মার বিষয় যা বুঝতে পারবে না, আমাকে এসে জিগগেস করো।

দুজনেই চলে গেলেন।

ফিরে এলে প্রজাপতি প্রশ্ন করলেন, কি দেখলে?

—আমরা আত্মাকে দেখলুম। আত্মার নখ, এমন কি গায়ের লোম পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি।

প্রজাপতি হেসে বললেন, আচ্ছা, তোমরা আর একটা কাজ কর। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সুন্দর সুন্দর অলংকার আর কাপড় চোপড় পর। তার পর আবার জলের কাছে গিয়ে দেখে এস।

তাঁরা ফিরে এলে প্রজাপতি জিগগেস করলেন, এবার কি দেখলে?

তাঁরা উত্তর করলেন, আমরা দুজন আত্মাকে দেখলুম। আমরা যে রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যে রকম কাপড় চোপড় ও অলংকার পরেছি, আত্মাও সে রকম সব পরেছেন।

প্রজাপতি বললেন, সেই আত্মাই ব্রহ্ম, তাঁর ভয় নেই, তাঁর মৃত্যু নেই।

প্রজাপতির কথা শুনে তুজনের মনে বড় আনন্দ হল। তাঁরা ভাবলেন আত্মাকে তাঁদের জানা হয়ে গেছে। তাই খুশী মনে তাঁরা বাড়ি ফিরে চললেন।

তাঁদের চলে যেতে দেখে প্রজাপতি আপন মনেই তুঃখ করে বললেন, এঁরা আত্মাকে না জেনেই চলে গেল। দেবতা হোক বা অস্থর যেই হোক না কেন, আত্মাকে জানতে না পারলে মৃত্যুর হাত থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

বিরোচন অস্থরদের মাঝে ফিরে যেতেই সব অস্থর তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিগগেস করতে লাগল, কি হল রাজা? কি জেনে এলে?

বিরোচন আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন, জেনে এসেছি। সব জেনে এসেছি। এই শরীরই আত্মা। এই শরীরের যত্ন কর, শরীরকে স্থখী কর, তোমাদের সব কামনা পূর্ণ হবে। আর আমাদের কোন ভাবনার কারণ নেই।

অসুরদের মাঝে উৎসব লেগে গেল। কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। মেয়ে পুরুষ সবাই নেচে গেয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে রাত দিন উৎসব করতে লাগল।

ইন্দ্রও মনের আনন্দে ফিরে চলেছেন দেবতাদের কাছে। যতই যাচ্ছেন, ততই তাঁর মনে নানা রকমের চিন্তা ও বিচার হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের কাছে যাওয়া আর হল না, আবার তিনি ফিরে চললেন প্রজাপতির কাছে।

প্রজাপতি দেখলেন, যজ্ঞকাঠ হাতে করে আবার ইন্দ্র ফিরে এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর ইন্দ্র? তুমি তো বেশ খুশী মনে ফিরে গিয়েছিলে। আবার এলে যে?

—আমি ভেবে দেখলুম, ইন্দ্র বললেন, আমি ভেবে দেখলুম আমার এই শরীরকে সাজালে আত্মাও সাজে, শরীরকে সুন্দর করলে আত্মাও সুন্দর হয়। তাহলে শরীর যদি রোগা হয়, আত্মাও রোগা হবে। শরীর যদি মরে যায়, আত্মাও তো মরে যাবে। অথচ আপনি বলেছেন—আত্মার রোগ নেই, মৃত্যু নেই—

প্রজাপতি বললেন, ইন্দ্র, তুমি ঠিকই বুঝেছ। আমার

আশ্রমে থেকে তুমি আরও কিছুকাল তপস্যা কর। আমি তোমাকে আবার উপদেশ করব।

প্রজাপতির আদেশ মাথায় নিয়ে ইন্দ্র আবার তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। এ ভাবে কেটে গেল কত বছর। তারপর একদিন প্রজাপতি নিজে থেকেই ডাকলেন ইন্দ্রকে। বললেন, ঘুমন্ত মানুষের অন্তরে যিনি জেগে থাকেন, তিনি আত্মা, তাঁর ভয় নেই মৃত্যু নেই, তিনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতিকে প্রণাম করে ইন্দ্র আবার ফিরে চললেন দেবতাদের দেশে। তিনি মনে করলেন তাঁর যা শেখবার ছিল শেখা হয়ে গেছে। চলছেন আর মনে মনে ভাবছেন। দেবতাদের কাছাকাছি গিয়েও আর যাওয়া হল না। আবার তিনি ফিরে এলেন প্রজাপতির কাছে। হাতে তাঁর যজ্ঞ-কাঠ।

প্রজাপতি বললেন, কি ইন্দ্র? আবার যে ফিরে এলে?

ইন্দ্র বললেন, গুরুদেব, আমরা যখন ঘুমই, স্বপ্নদেখা মানুষটাই তো তখন জেগে থাকে। স্বপ্নে সে কত কিছুই তো দেখে। সে দেখে হয়তো কেউ তাকে মারছে, হয়তো তার অসুখ করেছে। স্বপ্নে সে হাসে কাঁদে। সে কি করে আত্মা হবে? কারণ আত্মার তো দুঃখ নেই, রোগ নেই,—

প্রজাপতি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। আরও কিছু দিন তপস্যা কর, আবার নতুন উপদেশ পাবে।

আবার ইন্দ্র তপস্যা করতে লাগলেন।

অনেক বছর পর প্রজাপতি একদিন ইন্দ্রকে ডেকে বললেন, ইন্দ্র, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি শোন। ঘুমন্ত মানুষের অন্তরে

যিনি আনন্দে থাকেন, অথচ স্বপ্ন দেখেন না, তিনিই আত্মা। তাঁর রোগ নেই, মৃত্যু নেই, তিনিই ব্রহ্ম।

খুশী হয়ে ইন্দ্র ফিরে চললেন। কিন্তু এবারও দেবতাদের কাছে যাওয়া তাঁর হল না। আবার তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিলে। আবার তিনি ফিরে গেলেন প্রজাপতির কাছে।

—কি ইন্দ্র, আবার কি সন্দেহ হল তোমার?

—গুরুদেব, খুব গাঢ় ঘুম যখন হয়, তখন আমরা স্বপ্ন দেখি না। কিন্তু কোন জ্ঞানও তো তখন আমাদের থাকে না। এতো মরার সামিল। অথচ আপনি বলছেন আত্মা—

—হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। আচ্ছা, আরও সামান্য কিছুদিন তপস্যা কর। আবার আমি তোমাকে উপদেশ দেব।

ইন্দ্র এর আগে পর্যন্ত সব শুদ্ধ ৯৬ বৎসর তপস্যা করে-ছিলেন প্রজাপতির আশ্রমে। এবার আরও ৫ বৎসর তপস্যা করলেন। তখন তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়ে গেল।

প্রজাপতি তাঁকে ডেকে বললেন, ইন্দ্র, তুমি কঠোর তপস্যা করেছ। সত্য জানবার জন্যে একাদিক্রমে ১০১ বৎসর সাধনা করেছ। তুমি জ্ঞান পাবার যথার্থই উপযুক্ত হয়েছ। মন যদি নির্মল না হয়, তাহলে জ্ঞানের কথা শুনেও বুঝতে পারা যায় না। আমি জানি তুমি এখন সবই বুঝতে পারবে।

একটা স্বর্গীয় আনন্দের দীপ্তিতে ইন্দ্রের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নচিকেতা

তখনকার দিনে এমন অনেক ঋষি ছিলেন, যাঁরা ঋষিও ছিলেন, রাজাও ছিলেন। তাঁদের বলা হত রাজর্ষি। উদ্দালক ছিলেন সে সময়ের খুব নামকরা একজন রাজর্ষি। উদ্দালকের বাবাও অন্নদান করে খুব নাম কিনেছিলেন। উদ্দালকের মনেও দান করবার বাসনা এক সময় খুব প্রবল হয়ে উঠল। অন্যান্য ঋষিদের সংগে পরামর্শ করে তিনি বিশ্বজিৎ নামক একটা বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

যজ্ঞ ছিল নানারকমের। যার যত বেশী শক্তি সে তত বড় যজ্ঞ করত। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করা বড় যে-সে ব্যাপার ছিল না। রাজর্ষি ছাড়া আর কেউ এ যজ্ঞ বড় একটা করতে পারত না। এ যজ্ঞ যাঁরা করতেন, যজ্ঞের সময় তাঁরা তাঁদের যথাসর্বস্ব ব্রাহ্মণ আর গরিবদের মাঝে দান করে দিতেন। এজন্যে এ যজ্ঞে লোকও হত বেশী, আবার নামও হত বেশী।

উদ্দালকের বাড়ি বিরাট আয়োজনে যখন যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, উদ্দালকের ছেলে নচিকেতা তখন ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। নচিকেতা ছোট্ট ছেলে, ছোট হলে কি হয় মনটি তার খুব ভাল। সে দেখলে যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। চারপাশে বসে ঋষিরা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করে তাতে আহুতি দিচ্ছেন।

নচিকেতা দেখলে আর এক জায়গায় শত শত ব্রাহ্মণ বসে

মধুর কণ্ঠে বেদ গান করছেন। তাদের সম্মিলিত গানে যজ্ঞ-বাড়ির আকাশ বাতাস যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে।

এই সব দেখে বালকের মনে একটা গভীর শ্রদ্ধা দেখা দিলে। ঘুরে ঘুরে সে আরও দেখতে লাগল। আর এক জায়গায় গিয়ে সে দেখতে পেলে অনেকগুলো বুড়ো গাই এনে রাখা হয়েছে আর সেগুলো দান করা হচ্ছে। বালক হলেও নচিকেতার মনে বেশ একটা বিচার করবার শক্তি ছিল। সে মনে মনে ভাবলে, তাইতো, এই সব বুড়ো বুড়ো গাই, আর কখনও তো এরা বাচ্চা দেবে না, তুধও দেবে না। এগুলো দান করে লাভ কি? খুব কম দামে কিনতে পেয়েই বোধ হয় বাবা এগুলো কিনে নিয়ে এসেছেন। গরু দান করলে খুব পুণ্য হয়। কিন্তু এ রকম গরু দান করলে পুণ্য না হয়ে পাপই তো হবে।

সমস্ত যজ্ঞশালা দেখে তার মনে যে শ্রদ্ধা ও আনন্দ হয়েছিল, এই ফাঁকি-দেওয়া দানের আয়োজন দেখে সেরকমই তুঃখ হল। সে ভাবলে, আমিও তো আমার বাবার একটি সম্পত্তি। আমাকেও দান করা তাঁর কর্তব্য। আর গরুদান করে যে পাপ তিনি করছেন, আমাকে দান করলে তা অনেকটা কেটে যাবে নিশ্চয়ই।

যেই ভাবা সেই কাজ। সোজা সে তার বাবার কাছে উপস্থিত হয়ে বললে, বাবা, আমাকে তুমি কার কাছে দান করছ?

উদ্দালক তখন ঋষিদের সংগে বসে যজ্ঞের কাজে ভারী

ব্যস্ত ছিলেন। নচিকেতার কথায় তিনি কোনই জবাব দিলেন না। আবার সে জিগগেস করলে, বাবা, আমাকে তুমি কার কাছে দান করছ ?

উদ্দালক জবাব দিলেন, যা এখান থেকে, এখন জ্বালাতন করিস নে।

নচিকেতা বললে, বেশ তো, আমি চলে যাচ্ছি। আগে তুমি বল আমাকে কার কাছে দান করছ।

এ কথায় উদ্দালক ভয়ানক চটে গেলেন। চীৎকার করে বললেন, যমের কাছে যা।

নচিকেতা চলে গেল।

সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। নচিকেতার দিকে ফিরে চাইবার অবসর কারুর নেই। কিন্তু বাবার কথা নিয়ে নচিকেতা একটা দারুণ ভাবনায় পড়ে গেল। সে ভাবতে লাগল, আমাকে বাবা যমের কাছে দান করলেন। আচ্ছা, আমাকে এ ভাবে দান করে বাবার কি লাভটা হবে ?

যমের বাড়ি যাওয়া তো বড় সহজ কাজ নয়। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে আর ফিরে আসবার উপায় থাকে না। কাজেই যমের কাছে যেতে গেলে সংসারের সকল মায়া সকল আশা আকাংক্ষা ত্যাগ করেই যেতে হয়। নচিকেতা ভাবলে, বাবা কি সত্যি সত্যি যমের কাছে দান করেছেন, না রেগে গিয়ে ও-রকম বলেছেন। যমের বাড়ি আমাকে যেতে হবে না।

জীবনে মাত্র একটি বারই মানুষ যমের বাড়ি যায়। তাই

যমের বাড়ির নামে সকলের মনেই ভয় হয়। নচিকেতার মনেও ভয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সে জোর করে ভয়কে তাড়িয়ে দিলে। ভাবলে, অনেকের মাঝে আমি প্রথম, আবার অনেকের মাঝে আমি মধ্যমও হতে পারি। কিন্তু আমি কখনও সকলের অধম নই। আমাকে ভীত হলে চলবে না। রাগ করেই বলুন আর খুশী হয়েই বলুন, যজ্ঞের জায়গায় বাবার মুখ থেকে যে কথাটি বেরিয়েছে, সেটি তাঁরও মানা উচিত, আমারও পালন করা উচিত।

যমের বাড়ি যাবার জন্যে নচিকেতা তৈরী হল।

যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। নচিকেতা তখন তার বাবার কাছে গিয়ে বিদায় চাইলে। বাবা বললেন, সে কি নচিকেতা, আমি কি সত্যি সত্যিই তোকে দান করেছি নাকি? সে সময় বিরক্ত করেছিস বলেই না ও-রকম বলেছি? তুই কি শেষ কালে আমার ওপর অভিমান করে চলে যাবি?

অধিকাংশ মহাপুরুষের জীবনেই দেখা যায়, বালক বয়সে তারা যে রকম চিন্তা বা কাজ করেন, সাধারণ লোক বুড়ো বয়সেও তা করতে পারে না। নচিকেতা উত্তর করলে, রাগ অভিমানের কথা নয় বাবা। ছেলে বড় নয়, সত্যটাই বড়। অন্যান্য জীবজন্তুর মত জন্মাতে আর মরতে মানুষ পৃথিবীতে আসে নি। তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কথা আর বর্তমানে যাঁরা মহাপুরুষ আছেন তাঁদের কথা বিচার করে দেখ। যজ্ঞের সময় যে কথা উচ্চারণ করেছ, সেই কথার সত্য তোমাকে রাখতেই হবে।

বাবাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে নচিকেতা যমের বাড়ি যাত্রা করলে। যমের বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছল, তার চেহারা দেখে যমের বাড়ির লোকেরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। হাত যোড় করে তারা বললে, আপনি কে আমরা জানি নে। যমরাজ বাড়ি নেই। আমরাই আপনাকে অভ্যর্থনা করছি। আসুন, বাড়ির ভেতর আসুন, হাত পা ধুয়ে আরামে বিশ্রাম করুন।

তখনকার দিনের রীতিনীতি আজকাল নেই। সে সময় তো জুতো ছিল না। অধিকাংশ মানুষই শুধু পায়ে হাঁটত। তাই কোন অতিথি আসলে প্রথমেই তাকে পা ধুইবার জল দেওয়া হত। পা ধুইবার জলের নাম বলা হত পাদ্য।

পাদ্য দেবার পর অতিথিকে দেওয়া হত অর্ঘ্য। অর্ঘ্যে থাকত মালা চন্দন এবং নানা রকম পূজা-উপহার। এই পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া তখনকার দিনে একটা বিশেষ প্রথা ছিল।

নচিকেতা জিগগেস করলেন, যম বাড়ি নেই ?

কর্মচারীরা বললে, না। আপনি বাড়ির ভেতর আসুন।

—বাড়ির কর্তা যদি বাড়িতে না থাকেন, তাহলে অতিথির সেখানে যেতে নেই, থাকতেও নেই। আমি এখানে বাইরেই অপেক্ষা করি।

—বেশ তো, তাহলে আমরা এখানেই আপনার জন্যে পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে আসি।

—না, তাও ঠিক হবে না। নচিকেতা জবাব দিলে।

বাইরেই বসে রইল। এভাবে সারাদিন কেটে

গেল। কর্মচারীরা অনেক অনুরোধ করেও তাকে কিছু খাওয়াতে পারলে না। বাড়ির সবাই ভয়ে অস্থির।

পরের দিনও কেটে গেল যমের দেখা নেই। নচিকেতা ঠিক একভাবেই বাইরে বসে আছে। বাড়ির লোকেরা কোন প্রতিকারও করতে পারছে না, অথচ না খেয়ে না দেয়ে অতিথির এভাবে বসে থাকাটাও সহ্য করতে পারছে না। এভাবে তৃতীয় দিনও কেটে গেল, যম বাড়ি ফিরলেন না।

চতুর্থ দিন ভোর বেলা যম বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে পা দিতেই বাড়ির লোকেরা মহা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে বললে, অতিথি তিনদিন উপবাসী, শিগগির আপনি পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে যান। অতিথি বিরক্ত হলে আপনার কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। উনি আবার যে-সে অতিথি নন, তিনদিন আগে আমরা দেখলুম, অতিথি বালক যেন আগুনের মত উজ্জ্বল মূর্তি ধরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

যমরাজ তখনই ছুটে গেলেন এবং পরম সমাদরে নচিকেতাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। নচিকেতার মুখে সব কথা শুনে যম সত্যিই বড় খুশী হলেন। বললেন, আমি বাড়ি ছিলুম না। তিনদিন তুমি উপবাসে অনাদরে পড়ে আছ। আমার বড় ত্রুটি হয়ে গেছে। তার জন্যে আমি তোমার কি করতে পারি বল। তুমি আমার কাছে তিন দিনের জন্যে তোমার ইচ্ছে মত তিনটি বর চাও।

নচিকেতা খুশী হল। বললে, যদি আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার দেওয়া বর আমি মাথা

পেতে নিচ্ছি। আমার বাবাকে ছেড়ে আজ তিনদিন আমি চলে এসেছি। থেকে থেকে তাঁদের কথা আমার মনে হচ্ছে। রাগের মাথায় বাবা আমাকে দান করেছেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যথাসর্বস্ব দান করতে হয়। আমাকে দান করার পর বাবার

আমার যথার্থই সর্বস্ব দান করা হয়ে গেছে। আমার বার বারই মনে হচ্ছে, আমার শোকে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। প্রথম বরে আমি এই চাইছি, আমার বাবার রাগ যেন শান্ত হয়, আমার জন্যে তিনি কাতর না হন, আর আপনার কাছ থেকে আমি যখন আবার তাঁর কাছে ফিরে যাব, তখন তিনি যেন আমাকে চিনতে পারেন এবং আগেরই মত আমাকে আদর করেন ও ভালবাসেন।

যম বললেন, তাই হবে। তোমার বাবা তোমার জন্যে আর দুঃখ করবেন না। এখন থেকে রাত্রিবেলা তিনি আরামে ঘুমুতে পারবেন। তুমি ফিরে গেলে তোমাকে আগের মতই ভালবাসবেন, আদর করবেন। তোমার ওপর তাঁর আর কোন রাগই থাকবে না।

একবার যমের বাড়ি গেলে মানুষ সেই শরীর নিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরতে পারে না। কিন্তু যমের কাছ থেকে ফিরে আসবার বরও নচিকেতা পেলে। যম বললেন, এইবার দ্বিতীয় বরটি নাও।

নচিকেতা বললে, সংসারে কত ভয়, কত দুঃখ কষ্ট। শুনেছি স্বর্গে নাকি এ সব কিছুই নেই। সেখানে যারা থাকে, তারা নাকি পরম সুখেই থাকে। সেখানে নাকি কোন রোগ নেই, কেউ কখনও বুড়ো হয় না।

যমের দিকে চেয়ে নচিকেতা হেসে বললে, আর শুনেছি সেখানে নাকি আপনারও যাবার অধিকার নেই।

নচিকেতার কথায় যমও হেসে উঠলেন, বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, সেখানে মরণ বলে কিছু নেই। তারপর—

—স্বর্গে যেতে আমার বড় ইচ্ছে হয়। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন, কি ভাবে উপাসনা করলে স্বর্গে যাওয়া যায়।

যম একটা যজ্ঞের কথা বললেন। কি ভাবে কি করতে হয় একে একে নচিকেতাকে সব শিখিয়ে দিলেন। হয়তো পরীক্ষা করবার জন্যেই যম বললেন, আচ্ছা, আমি যা যা বললুম, তোমার মনে আছে তো ?

—আছে।

—বল দেখি।

যম যেমন যেমন বলেছিলেন, নচিকেতাও ঠিক ঠিক সেগুলো একে একে বলে গেলেন। নচিকেতার প্রতিভা আর মনে রাখবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে যম আরো খুশী হলেন।

—আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি নচিকেতা। তোমার মত একটি ছোট বালকের কাছে আমি অতটা আশা করি নি। আমি যে যজ্ঞটির কথা তোমাকে বললুম, আজ থেকে সেই যজ্ঞের অগ্নির নাম তোমার নামে নাচিকেত অগ্নি হবে। বেশ, এবার শেষ বরটি নাও।

বলতে বলতে যম তাঁর নিজের গলা থেকে একটি মুক্তোহার খুলে নচিকেতার গলায় পরিয়ে দিলেন।

নচিকেতা বললে, দেখুন একটি বিষয়ে আমি বড় গোলমালে পড়ে গেছি। ঠিক ঠিক জবাব আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে। আপনি যদি দয়া করে আমাকে তা বলে দেন।

যম জিগগেস করলেন, কি ?

নচিকেতা বলতে লাগল, মরবার পর মানুষের কি হয় ? কেউ কেউ বলেন, মরবার পর মানুষের আর কিছুই থাকে না। আবার শুনি কেউ কেউ বলেন, মরবার পরও মানুষের আসল সত্তাটি থাকে। এইটিই আমার তৃতীয় বর। এই বিষয়টি আপনি আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

যম বললেন, এ প্রশ্ন বড় কঠিন। দেবতাদের পর্যন্ত এতে সন্দেহ আসে। অনেক বড় বড় জ্ঞানীও এটি বুঝতে পারেন না। এ প্রশ্ন করো না। তোমার যা ইচ্ছে হয়, অন্য বর একটা চাও।

নচিকেতা উত্তর করলে, দেবতা ও জ্ঞানীরা পর্যন্ত যা বুঝতে পারেন না, তার মত বড় জিনিস আর কি কিছু আছে ? আর যদি এটি জানতে হয়, তাহলে আপনার মত উপযুক্ত গুরুই বা

আমি কোথায় পাব ? মরণের পরের কথা আপনি যেমন করে বলতে পারবেন, তেমনটি আর কেউ পারবে না। কারণ আপনিই যে মরণ পারাবারের কর্তা। এটি ছাড়া আর কি বর আমি চাইতে পারি ?

যম বললেন, কেন, এক শ বছর বেঁচে থাকবে, এ রকম ছেলে চাও নাতি নাতনী চাও। টাকা পয়সা সোনা রূপা, হাতি ঘোড়া গরু ভেড়া চাও, তারপরে মস্ত বড় একটা রাজ্যও চাইতে পার, আর কত দিন বাঁচতে চাও ? যত খুশী, শ হাজার লাখ বছরও যদি বেঁচে থাকবার ইচ্ছে হয়, তাই চাও না ? এই তোমার যা খুশী চাইতে পার। নচিকেতা, আমি কথা দিচ্ছি, যত বড় কামনাই হোক, আমি তা পূরণ করে দেব।

নচিকেতা বললে, হ্যাঁ, যত দিন আপনার রাজত্ব আছে, আমার পরমায়ুও তত বছর আমি পেতে পারব আপনার দয়ায়। কিন্তু তাতে কি সুখ ? দীর্ঘজীবী ছেলে মেয়ে আর নাতি নাতনী পেলেই কি সত্যিকার সুখ হয় ? আর ধন জন রাজ্য রাজত্ব, আজ আছে কাল নেই। আমি এসব কিছুই চাই নে।

যম বললেন, না নচিকেতা, অত ব্যস্ত হয়ো না। ভাল করে ভেবে দেখ। পৃথিবীতে সুখ ভোগ কে না চায়। যে সব জিনিস সংসারের লোকের কাছে দুর্লভ, বল, আমি তোমাকে সেগুলো সবই দিচ্ছি। শত শত নরনারী তোমার সেবা করবে, নেচে গেয়ে বাজনা শুনিয়ে তোমাকে সুখী করবে। রথ রথী সৈন্য সামন্ত রাজপ্রাসাদ, যা চাও তাই তুমি পাবে।

নচিকেতা জবাব দিলে, না যমরাজ, ঐ সব ভোগের জিনিস

তোমারই থাক। আমি এগুলো চাই নে। এসব দিয়ে আমি কি করব। দুদিন আগে আর পরে এই সব সুখের শেষ একদিন হবেই। তখন? না যমরাজ, আমি ও-সব চাই নে। যা চেয়েছি, আপনি আমাকে দয়া করে তাই দিন।

শেষকালে বাধ্য হয়েই যমরাজকে নচিকেতার ইচ্ছেটি পূরণ করতে হয়েছিল। মনের শক্তি ছিল নচিকেতার অদ্ভুত। তাই সে যমের কাছ থেকে এত বড় কঠিন জ্ঞানও সহজেই শিখে নিলে।